নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ১৩। ■ জানুয়ারি ২০১৮

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ১৩ । জানুয়ারি ২০১৮

সম্পাদকীয়

প্রকৃত শিক্ষাই একমাত্র সমাধান

"পৃথিবীর শেষ মাছটি যদি ধরে ফেলি, শেষ গাছটি যদি কেটে ফেলি, শেষ নদীটি যদি দূষিত করে ফেলি তবে থাকবে না কিছুই। থাকবে শুধু টাকা টাকা টাকা, টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে না কিছুই"- পৃথিবীতে আজ বাড়ছে শিক্ষার হার, মানুষ নাকি শিক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সমাজ তার সুফল পাচ্ছে কোথায়? আজকের বিশ্বসভ্যতা যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে চলেছে, হারাচ্ছে মানবিকতা। বাড়ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নষ্ট হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কগুলো, সমাজ হয়ে উঠছে অস্থির। পচন ধরছে মানব সমাজে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এর বহি:প্রকাশ ঘটছে। তবে দুনিয়া থেমে নেই, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, প্রযুক্তি, সভ্যতা, সব কিছুই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কেমন যেন লক্ষ্য হারা হয়ে পড়ছে সব। মানব সমাজের সার্বিক পরিবেশকে দুটি অংশে পৃথক করা যায়। একটি সামাজিক পরিবেশ, অন্যটি প্রাকৃতিক। এই দুই পরিবেশ আজ আর সুস্থ-স্বাভাবিক নেই, ভারসাম্যহীন হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ফলে মানুষে-মানুষে সম্পর্কে চিড় ধরছে। হত্যা, ধর্ষণ, মারামারি, কাটাকাটি, দুর্নীতি সামাজকে অস্থির করে তুলছে। অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য হারানোয় বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সময়ে-অসময়ে ঘটছে সাইক্লোন, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা ইত্যাদির মতন মহাবিপর্যয়। প্রশ্ন, কেন হচ্ছে এমন? কারণগুলো সকলেরই জানা। ভোগবাদ মানসিকতা, টাকার পেছনে ছুটে চলা, বাড়ছে চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান, বস্তুকেন্দ্রিক মানসিকতায় সমাজ ছাড়া হচ্ছে সুখশান্তি। আর সবচেয়ে বেশি অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে যুব সমাজ। যারা আগামী দিনের পৃথিবীকে রক্ষা করবে তারাই ঝরে পড়ছে শিক্ষা থেকে। যারাও বা শিক্ষিত হচ্ছে তারাও ভোগবাদী ও লোভাতুর হয়ে নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে পারছে না।

আমরা আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে রয়েছি যেখানে প্রকৃত শিক্ষাই এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই মানুষের প্রয়োজনেই আজ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষকে আবার মানবিকতার চর্চা করতে হবে। তবেই সুস্থ থাকবে সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ।

সূচিপত্র

১। একুশ শতকের শিক্ষার চাহিদা ও টেকসই, ... ২

২। কীভাবে শিক্ষা অন্যান্য টেকসই উন্নয়নে, ... ৪

৩। মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে শিক্ষা- কেন রবিনসন ৫

৪। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সমাজের দায়িত্ব ৯

৫। শিক্ষা হোক মূল্যবোধ বিকাশের সহায়ক ১০

৬। পরিবেশ ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু, ... ১১

৭। তোতাকাহিনী ১২

৮। সুখী মুক্ত মানুষের সন্ধানে শিক্ষা ১৫

৯। অন্য ভাবনার সৃজনের আসর ১৬

১০। হুমকির মুখে পরিবেশ ১৬

১১। *বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা* ঃ কনফুসিয়াস ১৭

১২। *এসো তাঁদের গল্প শোনাই* ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৯

১৩। *সেই সময়* ঃ বাঁকুড়া ২২

১৪। বন্ধ হোক দূষণ, সবুজে ঢাকুক স্কুল চত্বর ২৪

১৫। মজার মজার ইশকুল ২৫

১৬। পরিবেশ শিক্ষায় হাতে-কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির, ... ২৮

১৭। দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি ২৯

১৮। এই বিশ্ব ৩০

একুশ শতকের শিক্ষার চাহিদা ও টেকসই উন্নয়ন

উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। উন্নয়ন শব্দটির সমার্থক শব্দ উন্নতি, অগ্রগতি তথা পরিবর্তন। কারও মতে, উন্নয়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়ন, কারও কাছে স্বাধীনতা অর্জন। কারও কাছে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা অর্জন। এক-একটি জাতি তার বিদ্যমান অবস্থার আলোকে বেছে নেবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। তবে লক্ষ্যে ভিন্নতা থাকলেও সকল জাতিই উন্নয়নের পক্ষে একমত হবে এটা নিশ্চিত। প্রশ্ন হল, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা কী? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত ধারা কি টেকসই উন্নয়নের পক্ষে কথা বলে? শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তৈরি করে, যা ভবিষ্যত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তবে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের রূপরেখা অনুধাবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং-এর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন, যা কিনা ভবিষ্যতে এই উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বলতে বোঝায় শিখন এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্তকরণ। যেমন আবহাওয়ার পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র নিরসন, সাস্টেইনেবল কনজাম্পশন, বায়োডাইভারসিটি, ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যকার সৃষ্ট বৈষম্য নিরসন, মানবাধিকার, বিশ্বায়ন, উন্নত জীবন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি।

পৃথিবীর বাস্তসংস্থানের ওপর মানুষের চাহিদার চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এই বৃদ্ধির মাত্রা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশে বেশি। এই বৃদ্ধির বোধ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের থাকতে হয়, থাকা উচিত। কারণ আমরা কোথায় আছি, আমাদের অবস্থান নিয়ে ভাবতে শুরু না করলে এগিয়ে যাবার রাস্তায় পথ হারাতে হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে, বিশেষত পরিবেশ-বিজ্ঞানে এই জাতীয় ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হলে নিঃসন্দেহে তারা পৃথিবীর বায়োক্যাপাসিটি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করবে। তবে কেবল কারিকুলামে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তকরণ নয়, একই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির অনুসরণ করা দরকার যা কিনা শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে, পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগায়।

একটা মানসম্মত ও যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক ধারণার অনুশীলন লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিখনকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। একটি হল আমরা কী শিখব এবং সেটা কীভাবে? যদি আমরা পরিবেশগত সমস্যার কথা বলি, তাহলে এ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একটা ভূমিকা রাখতে পারে। আর এই ধরনের শিখন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে রপ্ত করতে পারে।

কাজেই আমাদের আশপাশের সমস্যা অনুধাবন এবং তার সমাধান সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায় হল শিক্ষা। যে শিক্ষা অর্জনে বিদ্যালয় এবং তার শিক্ষকদের ভূমিকা অনন্য। আবারও বলছি, এই উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই যা কিনা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদান ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এরফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা, ভবিষ্যতের জন্য সার্থক নীলনকশা অঙ্কন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি সহজতর হয়ে ওঠে।

তাহলে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন কী করে? এর একটা প্রধান উপায় হল, গ্রুপে আলোচনার ঝড় তোলা। যখন একজন শিক্ষার্থী একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় একটি নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপরে নিজস্ব মতামতগুলোকে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তখন উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা শানিত হয়। এক্ষেত্রে সমস্যাভিত্তিক শিখন একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা তৈরিই হতে হবে মূল লক্ষ্য। তাই শিখনের বিষয় এবং পদ্ধতি দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন হবে সমন্বয়ী; এরমধ্যে সবাই এবং সব আসবে। গবেষকরা সুবিধার জন্য 'সাস্টেইনেবিলিটির চেয়ার' বলে একটা ধারণার প্রচলন করেছেন। এই 'চেয়ারে'র চারটি পায়া আছে এবং নীতি-নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় এই চারটি পায়াকেই সমানভাবে সমন্বয় করতে হবে। কোনও একটি পায়াকে বেশি গুরুত্ব দিলে 'চেয়ার'টা ভারসাম্য হারাবে।

টেকসই উন্নয়ন অনেকখানিই সুরক্ষিত ও সুষম ইকোসিস্টেমের ওপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং মানুষের মানসম্মত জীবনধারণ ও নিরাপত্তার কথা বলে, যার ফলে একটা সাউন্ড ইকোনমিক্যাল অবস্থা অর্জন সম্ভব হয়। তবে টেকসই উন্নয়নকে এভাবে গুটিকতক উন্নয়নমূলক উপাদানের ওপরে নির্ভর করে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। একথা গ্যারান্টি দিয়ে হয়তো বলা সম্ভব যে, উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে শিক্ষার বড় রকমের অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। শিক্ষা মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যকে নিশ্চিত করে মানুষকে সমাজের একজন দায়িত্ববান ও উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল উপাদানটি হল মানসম্মত ও সৃজনশীলমূলক শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন আনয়ন, শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদান, কারিকুলাম তৈরিতে দক্ষতা আনয়নসহ অন্যান্য সব দিক পরিকল্পনার আওতায় আনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনা যায়, যা নিশ্চিত করবে একুশ শতকের শিক্ষার চাহিদা।

তবে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, তারা কি চলমান উন্নয়নের ধারাকেই অনুসরণ করবে নাকি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারা উন্মোচিত করবে, ভাববে নতুন কিছু? কারণ একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট, উন্নয়নের ধারা পরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই উন্নয়নের নতুন নতুন ধারাকে রপ্ত করতে হয়। সৃজনশীলতা সেখানে একটা মস্ত বড় ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাই সৃজনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় সর্বাগ্রে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁচতে শেখাই টেকসই উন্নয়নের ভিত মজবুত করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা তাই অপরিহার্য একটি মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে তাই নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। কারিকুলাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর স্ট্রাটেজিকে বিবেচনায় রেখে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক অবস্থাকে বিবেচনায় আনা; শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে একুশ শতকের চাহিদাকে গুরুত্ব প্রদান; বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বয়স ও মেধা যাচাই করা; উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া; পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতিতে ভিন্নতা আনার মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; আদর্শ শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকসহ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান; একুশ শতকের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা রাখা; শিক্ষকদের ডিজিটাল ক্লাসরুম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া; বাস্তব প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো; হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা বাড়ানো; মূলধারার শিখনের সঙ্গে অন্য ধারার শিক্ষাকেও গুরুত্ব প্রদান; নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান; বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়াসহ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। সেটি আমাদের মতন উন্নয়নশীল দেশের জন্যও সত্য। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। সব মানুষকে তাদের বোধগম্যতার স্তর বাড়িয়ে দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ তথ্য কেবল জানা বা শোনার নয়, বোঝারও। তথ্যকে বিশ্লেষণ করে একটি কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে শিক্ষা। শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেই জ্ঞানকে বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ করাও একটি বড় উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা তথ্য জানবে এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে দেশের একজন আস্থাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবার মাধ্যমে সমাজে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে, কাঙ্ক্ষিত গুণগত জীবন অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। নিঃসন্দেহে শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের বণ্টন সামঞ্জস্যহীন।

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় রকমের বাধা। এই বাধা অতিক্রমের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা বড় অবদান রাখতে পারে। নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাগ্রহণের হারের মধ্যে সমতা না আনতে পারলে উন্নয়নকে টেকসই করা সম্ভব নয়।

সাধারণত দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ আহরণ করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটিও একটি বড় রকমের সমস্যা। এই দুই গ্রুপের মানুষদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনাটাও একটা বড় রকমের কাজ। আসলে চিন্তা করলে যা স্পষ্ট হয় তা হল, উন্নয়ন চাই— তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা এই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করতে পারে তখনই যখন শিক্ষা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিশ্চিত করা হবে, একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনা হবে। তবে শিক্ষা অর্জনের ধরন আর প্রদানের ধরনে পরিবর্তন আনতে হবে। পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং এই শতকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা মাথায় রেখে শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটা কথা মাথায় রাখা জরুরি যে, গ্লোবালাইজেশন কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়; অন্যান্য ব্যাপারগুলোর সঙ্গেও জড়িত। এক দেশের মানুষ আর এক দেশে যাচ্ছে। সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটছে। তথ্যের আদানপ্রদান ঘটছে। বদলাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। পুরো বিশ্ব আজ মিলেমিশে একাকার। একটি দেশকে তাই সমৃদ্ধ করে তুলবার ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদান হবে অনস্বীকার্য। তাই সঠিকভাবে, প্রয়োগমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হবে।

সূত্র- এস এম রওনক রহমান আনন্দ, ০৯ জুলাই, ২০১৭ ইং(ইউনেস্কো)

সূত্র– এস এম রউনক রহমান আনন্দ

কীভাবে শিক্ষা অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনীয়ভাবে সংযুক্ত

লক্ষ্য ১ - মানুষকে দারিদ্রসীমার বাইরে আনার ক্ষেত্রে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য ২ - অধিকতর টেকসই কৃষিপদ্ধতি এবং পুষ্টির জ্ঞানলাভে মানুষকে সহায়তার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।

লক্ষ্য ৩ - স্বাস্থ্য সমস্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা তাৎপর্যবহ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন, অকালমৃত্যু, প্রজনন স্বাস্থ্য, রোগ সংক্রমণ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং মঙ্গলময় জীবন।

লক্ষ্য ৪ - মৌলিক সাক্ষরতা অর্জন, অংশগ্রহণমূলক দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন এবং জীবনচক্র বৃদ্ধিতে নারী ও বালিকাদের শিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য ৫ – দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা।

লক্ষ্য ৬ - বিশেষত জ্বালানি সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সৃষ্টিতে উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সাহায্য করতে পারে।

লক্ষ্য ৭ - শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে অর্থনৈতিক শক্তি, উদ্যোগ গ্রহণ, শ্রমবাজার দক্ষতার সরাসরি যোগ রয়েছে।

লক্ষ্য ৮ - অধিকতর শক্তিশালী অবকাঠামো এবং টেকসই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টিতে শিক্ষা প্রয়োজনীয়।

লক্ষ্য ৯ - সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা দূর করতে শিক্ষা নিশ্চিতভাবেই কার্যকরী। শিক্ষা মানুষকে এমন দক্ষতা প্রদান করতে পারে যার মাধ্যমে টেকসই নগর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করা যায়।

লক্ষ্য ১০ - উৎপাদন পদ্ধতি (যেমন, চক্রাকার অর্থনীতি) অধিকতর টেকসইভাবে প্রস্তুত সামগ্রীর ভোক্তা-বোধগম্যতা এবং অপচয় প্রতিরোধে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষ্য ১১ - বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে পরিবর্তনের প্রভাব, তার অভিঘাত মোকাবিলা ও সমাধানে শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষ্য ১২ - জলীয় পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং তার সুদক্ষ ও টেকসই ব্যবহারে সম্মিলিত কর্মমুখী প্রয়াসে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য ১৩ - টেকসই জীবনযাত্রায়, বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

লক্ষ্য ১৪ - অংশগ্রহণমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য সমাজ বিনির্মাণে এবং সামাজিক সুস্থিরতায় সামাজিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য ১৫ - জীবনব্যাপী শিখন টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা বুঝতে ও প্রণয়ন করতে এবং বাস্তবায়নে মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি করে।

সূত্র- বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ ২০১৬,গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট

মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে শিক্ষা- কেন রবিনসন

অনেক ধন্যবাদ আপনাদের,

১২ বছর আগে আমি আমেরিকাতে চলে এসেছিলাম আমার স্ত্রী টেরি আর দুই সন্তানকে নিয়ে। সত্যি কথা বলতে, আমরা আসলে লস এঞ্জেলসে চলে এসেছিলাম (দর্শকের হাসি)। এটা ভেবে যে, আমরা আমেরিকাতে চলে আসছিলাম, কিন্তু যাইহোক, এটা ছিল একটা ছোট বিমান ভ্রমণ- লস এঞ্জেলস থেকে আমেরিকা পর্যন্ত।

১২ বছর আগে এসেছিলাম এখানে আর যখন এলাম, আমাকে অনেক কিছু বলা হয়েছিল, যেমন, "আমেরিকানরা বিদ্রুপ বুঝতে পারে না। এই ধারণা খুঁজে পেয়েছেন কখনও? এটা সত্য নয়। এ দেশের আনাচে-কানাচে আমি ভ্রমণ করেছি। এমন কোনও প্রমাণ আমি পাইনি যে, আমেরিকানরা বিদ্রুপ বুঝতে পারে না। এটা সেই সব সাংস্কৃতিক উপকথার একটি। যেমন, "ব্রিটিশরা গম্ভীর প্রকৃতির।" আমি জানিনা মানুষ কেন এটা চিন্তা করে। যে দেশেরই মুখোমুখি হয়েছি আমরা, সেটাকেই আক্রমণ করে দখল করেছি। (হাসি) কিন্তু এটা সত্য নয় যে, আমেরিকানরা বিদ্রুপ বুঝতে পারে না, কিন্তু আমি চাই আপনারা জানুন যে, মানুষ আপনাদের অজান্তে আপনাদের সম্পর্কে সেটাই বলছে। জানেন তো, ইউরোপে আপনি যখন বৈঠকখানা থেকে চলে যান, মানুষ বলে ভাগ্য ভাল আপনার উপস্থিতির সময় কেউ বিদ্রুপাত্মক ছিল না।

কিন্তু আমি জানলাম যে, আমেরিকানরা বিদ্রুপ বোঝে, যখন এই আইনের কথা জানতে পারলাম- "বাদ যাবে না কোনও শিশু।" কারণ, যে ব্যক্তিই ওই শিরোনামের কথা ভেবে থাকুন না কেন, তিনি বিদ্রুপ বোঝেন, তাই নয় কি? কারণ - (হাসি) (হাততালি) কারণ, এটা লক্ষ লক্ষ শিশুকে বাদ দিচ্ছে। এখন আমি দেখতে পাই যে, কোনও আইনের জন্য সেটা খুব একটা আকর্ষণীয় নাম নয়, লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ পড়ে যায়। আমি তা দেখতে পাচ্ছি। পরিকল্পনাটা কী? ঠিক আছে, আমরা প্রস্তাব করি যেন লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ পড়ে যায় এবং এটা এভাবেই কাজ করতে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি জানলাম যে, আমেরিকানরা বিদ্রুপ বোঝে, যখন এই আইনের কথা জানতে পারলাম- "বাদ যাবে না কোনও শিশু।" কারণ, যে ব্যক্তিই ওই শিরোনামের কথা ভেবে থাকুন না কেন, তিনি বিদ্রুপ বোঝেন, তাই নয় কি?

এবং এটা সুন্দরভাবে কাজ করছে। দেশের (আমেরিকার) কিছু জায়গায় ৬০% শিশু হাইস্কুল থেকে ঝরে পড়ে। আমেরিকার আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোতে এই হার হল শতকরা ৮০ ভাগ শিশু। আমরা যদি সে সংখ্যাকে অর্ধেক করতাম, একটা অনুমান হল, তা আমেরিকার অর্থনীতিতে একটা নীট মুনাফা তৈরি করত যার পরিমাণ ১০ বছরে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা একটা ভাল অঙ্ক, তাই নয় কি, যা আমাদের করা উচিত? একটা বড় ধরনের অর্থ আসলে ব্যয় হয় (স্কুল থেকে) ঝরে পড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে।

কিন্তু এই ঝরে পড়ার ঝামেলাটা বিশাল সমস্যার ছোট একটা অংশ মাত্র, যেটা দেখা যায়। এটা সেসব শিশুকে বিবেচনা করে না যারা স্কুলে আছে, কিন্তু স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যারা এটাকে (স্কুলকে) উপভোগ করে না, যারা এখান (স্কুল) থেকে প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয় না।

আর এর কারণ এটা নয় যে, আমরা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করছি না। আমেরিকা শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য অধিকাংশ দেশের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে। (আমেরিকার) ক্লাসগুলোর আকার অনেক দেশের ক্লাসগুলোর চেয়ে ছোট। এবং প্রতি বছর শত শত উদ্যোগ নেওয়া হয় শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য। সমস্যা হল, এর সবকিছু ভুল দিকে যাচ্ছে। তিনটি মূলনীতি রয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন বিকশিত হয় এবং এগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ হয় শিক্ষার সংস্কৃতির মাধ্যমে যেখানে অধিকাংশ শিক্ষককে পরিশ্রম করতে হয় আর অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে সহ্য করে টিকে থাকতে হয়।

প্রথম মূলনীতি হল, মানুষ প্রাকৃতিকভাবে আলাদা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

আমি কি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনাদের মধ্যে কতজনের নিজের ছেলেমেয়ে রয়েছে? ঠিক আছে। অথবা নাতি-নাতনি। দুই ছেলেমেয়ে বা তারও বেশি? ঠিক আছে। আর বাকি সবাই এরকম ছেলেমেয়ে দেখেছেন। (দর্শকের হাসি) ঘুরঘুর করতে থাকা ছোট ছোট মানুষ। আমি একটা বাজি ধরব আপনাদের সাথে এবং এই বাজিতে জেতার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। আপনাদের যদি দুই বা তার বেশি ছেলেমেয়ে থাকে, আমি বাজি ধরছি যে, তারা একজন আরেকজনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নয় কি? তাই নয় কি? (হাততালি) আপনারা তাদেরকে কখনও গুলিয়ে ফেলবেন না, ফেলবেন কি? যেমন, তোমরা কে কোনজন? আমাকে মনে করিয়ে দাও। তোমাদের মা আর আমি রং দিয়ে তোমাদের চেনার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, যাতে আমরা গুলিয়ে না ফেলি।

"বাদ যাবে না কোনও শিশু"- আইনের অধীনে যে শিক্ষা, তা বৈচিত্র্যের উপর নয়, বরং প্রথাগত বাধ্যবাধকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্কুলগুলোকে যা করতে উৎসাহিত করা হয় তা হল, কৃতিত্ব অর্জনের একটা খুব সীমিত গণ্ডির মধ্যে শিশুরা কী

করতে পারে তা খুঁজে বের করা। "বাদ যাবে না কোনও শিশু"- আইনের অন্যতম ফলাফল হিসাবে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছোট হয়ে এসেছে তথাকথিত স্টেম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) শিক্ষাক্রমে। তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি এখানে বিজ্ঞান আর গণিতের বিরুদ্ধে বলতে আসিনি। ঠিক তার বিপরীতে, এগুলো দরকারী, কিন্তু যথেষ্ট নয়। প্রকৃত শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে শিল্পকলাতে, মানবিক বিভাগে, শারীরিক শিক্ষাতে। অনেক শিশু, দুঃখিত, ধন্যবাদ--(হাততালি)-- বর্তমানে আমেরিকার একটা আনুমানিক হিসাব হল, শতকরা ১০ ভাগের মতো শিশু বিভিন্ন লক্ষণসহ ধরা পড়ছে, যাকে বলা হচ্ছে অমনোযোগের অসুখ। এডিএইচডি (অমনোযোগের অসুস্থতা)। আমি বলছি না যে, এমন ব্যাপার বলে কিছু নেই। আমি শুধু বিশ্বাস করিনা যে, এটি এমন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ার মতো। আপনারা যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুদের বসিয়ে রাখেন অফিসের নিচু মানের কাজ করানোর জন্য, অবাক হবেন না যদি তারা ছটফট করতে শুরু করে, জানেন তো? (হাসি) (হাততালি) অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা মানসিক কোনও সমস্যাতে ভুগছে না। তারা কষ্ট পাচ্ছে শৈশবের কারণে। (দর্শকের হাসি) এবং আমি এটা জানার কারণ হল, আমি আমার প্রথম জীবন কাটিয়েছিলাম একজন শিশু হিসাবে। আমি পুরো ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। শিশুরা সবচেয়ে ভাল করে একটা উদার পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে, যা তাদের বিভিন্ন ধরনের মেধার প্রশংসা করে, শুধু সেসব মেধার ছোট একটা অংশকে নয়। আর, যা হোক, শিল্পকলা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে নয় যে, এগুলো গণিতের স্কোর ভাল করে। এগুলো (শিল্পকলা) গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা শিশুসত্তার বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যেগুলো অন্যথায় অধরা থেকে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা মানসিক কোনও সমস্যাতে ভুগছে না। তারা কষ্ট পাচ্ছে শৈশবের কারণে। (দর্শকের হাসি) এবং আমি এটা জানার কারণ হল, আমি আমার প্রথম জীবন কাটিয়েছিলাম একজন শিশু হিসাবে।

দ্বিতীয়টি (মূলনীতি) হল, ধন্যবাদ - (হাততালি)

দ্বিতীয় যে মূলনীতি মানুষের জীবনের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা হল জানার আগ্রহ। আপনারা যদি একজন শিশুর জানার আগ্রহকে জ্বালিয়ে দিতে পারেন, তারা প্রায় সময় এর বেশি সাহায্য ছাড়াই শিখবে। শিশুরা হল সহজাত শিক্ষার্থী। এটা একটা আসল কৃতিত্ব, এ বিশেষ ক্ষমতাকে অসুবিধায় ফেলে দেওয়া, অথবা দমিয়ে দেওয়া। জানার আগ্রহ হল অর্জনের চালিকাশক্তি। আমি যে কারণে এটা বলি, যদি আমি এভাবে বলতে পারি, বর্তমান সংস্কৃতির অন্যতম ফলাফল হল শিক্ষকদের পেশাদারিত্বকে কেড়ে নেওয়া। বিশ্বে এমন কোনও ব্যবস্থা বা কোনও দেশে এমন স্কুল নেই যা তার শিক্ষকদের চেয়ে ভাল। শিক্ষকরা হলেন স্কুলের সাফল্যের জীবনদাতা। কিন্তু শিক্ষাদান একটি সৃজনশীল পেশা। ঠিকভাবে চিন্তা করলে, শিক্ষাদান বক্তৃতাদানের একটা ব্যবস্থা নয়। জানেন তো, আপনারা শুধু জ্ঞানদানের জন্য সেখানে নেই। খুব ভাল শিক্ষকরা সেটা করেন, কিন্তু খুব ভাল শিক্ষকরা আরও যা করেন তা হল পরামর্শ দেন, উদ্দীপিত করেন, অনুপ্রেরণা যোগান, শিক্ষাকাজে (শিক্ষার্থীদের) জড়িত করেন। দেখুন, পরিশেষে শিক্ষা হল শেখার ব্যাপার। যদি কোনও কিছু শেখা না হয়, তাহলে সেখানে কোনও শিক্ষাকাজ চলছে না। এবং মানুষ প্রচুর সময় ব্যয় করতে পারে শেখার উপর কখনও কোনও আলোচনা ছাড়াই শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করার মাধ্যমে। শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল মানুষকে শেখার কাজটা করানো।

আমার একজন বন্ধু, পুরনো বন্ধু-- আসলে অনেক পুরনো, সে আর জীবিত নেই। (হাসি) এটা ততটুকুই পুরনো হতে পারে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে। কিন্তু সে চমৎকার একজন মানুষ ছিল, চমৎকার এক দার্শনিক। সে কাজ আর অর্জনের অর্থের পার্থক্য নিয়ে কথা বলত। জানেন তো, আপনারা কোনও একটা কাজে জড়িত থাকতে পারেন, কিন্তু সেটা আসলে অর্জন করতে পারছেন না, ডায়েটিংয়ের মতো। এটা একটা খুব ভাল উদাহরণ, জানেন তো। এই তো তিনি। ডায়েটিং করছেন। ওনার কি ওজন কমছে? না, কমছে না আসলে। শিক্ষাদান হল এমন একটা শব্দ। বলতে পারেন, "উনি ডেবোরাহ, ৩৪ নং রুমে আছেন, তিনি শিক্ষাদান করছেন।" কিন্তু কেউ যদি কিছু না শেখে, তিনি হয়তো শিক্ষাদানের কাজে জড়িত আছেন কিন্তু আসলে কাজটা সম্পূর্ণ করছেন না।

একজন শিক্ষকের ভূমিকা হল শেখার কাজকে সহজ করা। এই তো। এবং আমি মনে করি, সমস্যার অংশ হল, শিক্ষার মূল সংস্কৃতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে শিক্ষাদান আর শেখার উপর নয়, বরং পরীক্ষার উপর। পরীক্ষা প্রয়োজনীয়। মানোপযোগী করা পরীক্ষাগুলোর একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু তাদের উচিত নয় শিক্ষার মূল সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়া। তাদের উচিত বিশ্লেষণধর্মী হওয়া। তাদের উচিত সাহায্য করা। (হাততালি) আমি যদি একটা ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য যাই, আমি কিছু মানসম্মত পরীক্ষা চাই। আসলেই চাই। আমি জানতে চাই আমার কোলেস্টেরলের পরিমাণ যা একটা মানসম্মত স্কেলে অন্য সবার কোলেস্টেরলের পরিমাণের সাথে তুলনা করা। আমি এমন একটা স্কেলের ভিত্তিতে এটা জানতে চাই না যা ডাক্তার তার গাড়িতে উদ্ভাবন করেছেন।

কিন্তু শেখার কাজকে যাদের সাহায্য করা উচিত, তাদের উচিত নয় এ কাজকে ব্যাহত করা, যা প্রায় সময় এটা (পরীক্ষা) করে। ফলে জানার আগ্রহের জায়গায় আমাদের যা আছে তা হল নিয়মনীতি পালনের একটা সংস্কৃতি।

"আপনার যে পরিমাণ কোলেস্টেরল, তাকে আমি বলি লেভেল কমলা।"

"তাই নাকি? সেটা কি ভাল?" "আমরা জানি না।"

কিন্তু শেখার কাজকে যাদের সাহায্য করা উচিত, তাদের উচিত নয় এ কাজকে ব্যাহত করা, যা প্রায় সময় এটা (পরীক্ষা)

করে। ফলে জানার আগ্রহের জায়গায় আমাদের যা আছে তা হল নিয়মনীতি পালনের একটা সংস্কৃতি। আমাদের শিশু এবং শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়া হয় নিয়মমাফিক সমাধান পদ্ধতি অনুসরণ করতে, কল্পনা আর জানার আগ্রহের শক্তিকে সক্রিয় করার পরিবর্তে। এবং তৃতীয় মূলনীতিটি হল, মানুষের জীবন সহজাতভাবে সৃজনশীল। এ কারণে আমাদের সবার বিভিন্ন জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে। আমরা আমাদের জীবন সৃষ্টি করি এবং আমরা যখন তাদের মধ্য দিয়ে যাই তখন তাদের পুনরায় সৃষ্টি করতে পারি। এটা হল একজন মানুষ হবার সাধারণ রীতি। এটার কারণে মানুষের সংস্কৃতি এত কৌতুহলোদ্দীপক ও বিচিত্র এবং প্রগতিশীল। আমার কথা হল, অন্য প্রাণীদের হয়তো কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা থাকতে পারে, কিন্তু তার তেমন কোনও প্রমাণ নেই, আছে কি? যা আমাদের বেলায় আছে? আপনার একটা কুকুর থাকতে পারে। এবং কুকুরটার হয়তো মন খারাপ হতে পারে। কিন্তু এটা রেডিওহেড (একটি ইংরেজি ব্যান্ডদল) শোনে না, শোনে কি? (হাসি) এবং এক বোতল জ্যাক ড্যানিয়েলস (এক ধরনের হুইস্কি) নিয়ে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে? (হাসি)

ছাত্রছাত্রীরাই শিখছে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের, তাদের জানার আগ্রহকে, স্বাতন্ত্র্যকে ও সৃজনশীলতাকে। এভাবেই আপনারা তাদের শেখার কাজটা করাতে পারেন।

এবং আপনি বলেন, "তুমি কি হাঁটতে আসতে চাও?"

সে বলে, "না, আমি ঠিক আছি। তুমি যাও। আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু ছবি তুলো।" আমরা সবাই আমাদের নিজেদের জীবন সৃষ্টি করি বিকল্প ও সম্ভাবনাগুলোকে কল্পনা করার অবিরাম এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং শিক্ষার অন্যতম ভূমিকা হল সৃজনশীলতার এই শক্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলা ও উন্নত করা। এর বদলে আমাদের যা আছে তা হল কোনও কিছুকে মানোপযোগী করে তোলার একটা সংস্কৃতি।

এটাকে সেরকম হতে হবে না। আসলেই হতে হবে না। ফিনল্যান্ড নিয়মিতভাবে শীর্ষে থাকে গণিত, বিজ্ঞান ও রিডিংয়ের ক্ষেত্রে। এখন, আমরা শুধু জানি তারা সেগুলোতে ভাল করে কারণ, বর্তমানে সেটাই পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার অন্যতম সমস্যা হল এটা। তারা অন্য কিছু খোঁজে না যেগুলো সমান গুরুত্ব বহন করে। ফিনল্যান্ডে কাজের ব্যাপারটা হল এমন, তারা ওই শিক্ষাক্রমগুলো (গণিত, বিজ্ঞান ও রিডিং) নিয়ে পড়ে থাকে না। শিক্ষার বেলায় তাদের একটি খুব উদার পন্থা রয়েছে যা মানবিক বিভাগ, শারীরিক শিক্ষা, শিল্পকলাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

"আসলে আমাদের এমন কেউ নেই। কেনই বা আপনি স্কুল থেকে ঝরে পড়বেন? যদি কেউ সমস্যায় পড়ে, আমরা তাড়াতাড়ি তাদের কাছে যাই ও সাহায্য করি আর সমর্থন দিই।"

দ্বিতীয়ত, ফিনল্যান্ডে কোনও কিছুকে মানোপযোগী করে তোলার পরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। কিছুটা আছে, কিন্তু তা এমন কিছু নয় যা মানুষকে সকালে ঘুম থেকে ওঠায়। এটা এমন কিছু নয় যা তাদেরকে ডেস্কে ধরে রাখে।

এবং তৃতীয় বিষয়টা হল, সম্প্রতি আমি একটা বৈঠকে ছিলাম ফিনল্যান্ডের কিছু লোকের সাথে, আসল ফিনিশ, এবং আমেরিকান ব্যবস্থা থেকে একজন ব্যক্তি ফিনল্যান্ডের লোকদের বলছিলেন যে, "স্কুল থেকে ঝরে পড়াদের বেলায় আপনারা ফিনল্যান্ডে কী করেন?"

আর তাদেরকে কিছুটা হতবুদ্ধি দেখালো, এবং তারা বললেন, "আসলে আমাদের এমন কেউ নেই। কেনই বা আপনি স্কুল থেকে ঝরে পড়বেন? যদি কেউ সমস্যায় পড়ে, আমরা তাড়াতাড়ি তাদের কাছে যাই ও সাহায্য করি আর সমর্থন দিই।"

এখন মানুষ সবসময় বলে, "জানেন তো, আপনি ফিনল্যান্ডকে আমেরিকার সাথে তুলনা করতে পারেন না।"

না। আমি মনে করি ফিনল্যান্ডে প্রায় পাঁচ মিলিয়নের মতো জনসংখ্যা রয়েছে। কিন্তু আপনারা এটা আমেরিকার একটা প্রদেশের সাথে তুলনা করতে পারেন। আমেরিকার অনেক প্রদেশে এর চেয়ে কম মানুষ রয়েছে। আমার কথা হল, আমি আমেরিকার কিছু প্রদেশে গিয়েছি এবং আমি ছিলাম সেখানকার একমাত্র মানুষ। (হাসি) আসলেই। সত্যি। আমি চলে যাবার সময় সেগুলোকে তালাবদ্ধ করতে বলা হয়েছিল। (হাসি)

কিন্তু বিশ্বে ভাল করতে থাকা সব ব্যবস্থা যা করে তা বর্তমানে, দুঃখজনকভাবে, আমেরিকার ব্যবস্থাগুলোতে সুস্পষ্ট নয়-- সবকিছু যদি বিবেচনা করি। একটা হল, তারা (ভাল করা ব্যবস্থাগুলো) শিক্ষাদান আর শিক্ষালাভকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। তারা স্বীকার করে যে, ছাত্রছাত্রীরাই শিখছে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের, তাদের জানার আগ্রহকে, স্বাতন্ত্র ও সৃজনশীলতাকে। এভাবেই আপনারা তাদের শেখার কাজটা করাতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তারা শিক্ষকতার পেশাকে একটা খুব উঁচু পদমর্যাদা দিয়ে থাকে। তারা স্বীকার করে যে, আপনারা শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন না যদি শিক্ষাদানের জন্য খুব ভাল মানুষকে নির্বাচন না করেন এবং যদি তাদের নিয়মিত সমর্থন ও পেশাদারি উন্নয়নের সুবিধা দিয়ে না থাকেন। পেশাদারি উন্নয়নে বিনিয়োগ করা একটা ক্ষতি নয়। এটা একটা বিনিয়োগ এবং সফলতা অর্জনকারী আর সব দেশ এটা ভালভাবে জানে, হোক সেটা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং বা সাংহাই। তারা জানে যে, এটাই হল ব্যাপার।

এবং তৃতীয়ত, তারা দায়িত্ব ছেড়ে দেয় স্কুল পর্যায়ের উপর, এ কাজটা করানোর জন্য। দেখুন, এখানে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রীয় আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ নীতি' গ্রহণের বেলায়-- কিছু কিছু ব্যবস্থাতে যা হয়ে থাকে। জানেন তো, কেন্দ্রীয় সরকারগুলো বা প্রাদেশিক সরকারগুলো মনে করে তারা সবচেয়ে ভাল জানে এবং তারা আপনাদের বলবে কী করতে হবে। সমস্যা হল যে, শিক্ষা আমাদের আইন-প্রণয়নকারী

সভাকক্ষগুলোতে পরিচালিত হয় না। এটা ঘটে ক্লাসরুম ও স্কুলগুলোতে, আর যারা এটা করেন তারা হলেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং আপনারা যদি তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাকে খর্ব করেন, এটা (শিক্ষা) কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আপনাকে এটা মানুষদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। (হাততালি)

এ দেশে চমৎকার কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমাকে বলতে হবে যে, এটা ঘটছে শিক্ষার মূল সংস্কৃতি এমন হবার পরও, এ সংস্কৃতির কারণে এটা ঘটছে না। এটা যেন সবসময় বিপরীমুখী তীব্র বাতাসের দিকে মানুষের জাহাজ চালানোর মতো। এবং আমি মনে করি এর কারণ হল যে, বর্তমান অনেক নীতি শিক্ষার যান্ত্রিক ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা যেন একটা কারখানাজাত প্রক্রিয়া যেটাকে শুধু ভাল উপাদান থাকলে উন্নত করতে পারা যাবে, এবং আমি মনে করি, কিছু নীতিনির্ধারকের মনে এ ধারণা রয়েছে যে, আমরা যদি এটাকে (শিক্ষাকে) যথেষ্ট ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিই, আমরা যদি এটাকে শুধু ঠিকঠাক করি, এটা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে কাজ করবে। এটা করবে না, এবং কখনও করেনি।

মূলকথা হল যে, শিক্ষা একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। এটা একটা মানবীয় ব্যবস্থা। এটা মানুষদের নিয়ে, যারা হয় শিখতে চায় অথবা শিখতে চায় না। স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটা কারণ আছে যার শিকড় রয়েছে তাদের নিজের জীবন-কাহিনিতে। তারা হয়তো এটাকে (স্কুল) ক্লান্তিকর মনে করতে পারে। তারা হয়তো এটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করতে পারে। তারা হয়তো মনে করতে পারে যে, এটা তাদের স্কুলের বাইরের জীবনের সাথে বেমানান। গল্পগুলোতে সাধারণ মোড় রয়েছে, কিন্তু তারা সবসময় অনন্য। সম্প্রতি আমি লস এঞ্জেলসে একটি বৈঠকে ছিলাম -- তাদেরকে বলা হয় বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম। এসব কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে শিশুদের শিক্ষাকাজে ফেরানোর জন্য। তাদের নির্দিষ্ট সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা খুব ব্যক্তিঘনিষ্ঠ। তাদের আছে শিক্ষকদের জন্য শক্ত সমর্থন, জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর একটি উদার ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম এবং প্রায়ই এমন কর্মসূচি যেগুলো শিক্ষার্থীদের স্কুলের ভেতরে ও বাইরে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং তারা (কার্যক্রমগুলো) ভালভাবে কাজ করে। আমার কাছে আগ্রহের বিষয় হল, এগুলোকে বলা হয় "বিকল্প শিক্ষা।" জানেন? এবং সারা বিশ্বের প্রমাণ হল, যদি আমরা সবাই তা করতাম, বিকল্প শব্দটার কোনও প্রয়োজন থাকত না। (হাততালি)

কাজেই আমি মনে করি, আমাদেরকে আলাদা একটি উপমা বেছে নিতে হবে। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এটি (শিক্ষা) একটি মানবীয় ব্যবস্থা, এবং কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যেগুলোর ভেতর মানুষ উন্নতি লাভ করে, আর কিছু পরিস্থিতির অধীনে উন্নতি লাভ করে না। সর্বোপরি আমরা সবাই প্রাকৃতিক জীব, এবং স্কুলের সংস্কৃতি অপরিহার্য। সংস্কৃতি একটি মৌলিক শব্দ, তাই নয় কি?

আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে ডেথ ভ্যালি নামে একটা জায়গা খুব দূরে নয়। ডেথ ভ্যালি আমেরিকার সবচেয়ে গরম আর শুষ্ক জায়গা, এবং সেখানে কিছু জন্মায় না। সেখানে কিছু জন্মায় না, কারণ সেখানে বৃষ্টি হয় না। অতএব, ডেথ ভ্যালি। ২০০৪ সালের শীতকালে ডেথ ভ্যালিতে বৃষ্টি হয়েছিল। খুব অল্প সময় ধরে সাত ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল। এবং ২০০৫ সালের বসন্তে একটা অনন্য সাধারণ ব্যাপার ঘটল। ডেথ ভ্যালির পুরোটা ফুলের গালিচা হয়ে গিয়েছিল অল্প সময়ের জন্য। এটা যা প্রমাণ করেছিল তা হল, ডেথ ভ্যালি নিষ্প্রাণ নয়। এটা ঘুমন্ত। এর উপরিভাগের ঠিক নিচে রয়েছে সম্ভাবনার বীজ যেগুলো সঠিক পরিস্থিতির অপেক্ষা করছে আর প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, যদি পরিস্থিতি ঠিক থাকে, জীবন অবশ্যম্ভাবী। এটা সবসময় ঘটে থাকে। আপনারা একটা এলাকা, একটা স্কুল, একটা জেলার কথা ধরুন, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটান, মানুষকে দিন সম্ভাবনার ভিন্ন একটা অর্থ, ভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা, সুযোগের বড় একটা পরিসর, শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সম্পর্কগুলোকে পরিচর্যা ও মূল্যায়ন করুন, মানুষকে স্বাধীনতা দিন সৃজনশীল হবার ও তারা যা করে তাতে নতুনত্ব আনার, এবং যেসব স্কুল সক্রিয় হওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল তাদেরও এই স্বাধীনতা দিন।

আমরা যদি আরও বেশি মানুষকে উৎসাহিত করতে পারি, সেটা হবে একটা আন্দোলন। আর যদি আন্দোলনটা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তা প্রকৃত অর্থে একটা বিপ্লব হবে। এবং সেটাই আমাদের প্রয়োজন।

খুব ভাল নেতারা সেটা জানেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রকৃত ভূমিকা -- এবং আমি মনে করি এটা সত্য জাতীয় পর্যায়, প্রদেশ পর্যায়ে, স্কুল পর্যায়ে-- রাষ্ট্রীয় আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিতে নয় এবং তা হওয়া উচিত নয়। নেতৃত্বের আসল ভূমিকা হল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, সম্ভাবনার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা। এবং আপনারা যদি তা করেন, মানুষ তাতে সাড়া দেবে আর এমন কিছু অর্জন করবে যা আপনারা পুরোপুরি অনুমান করেননি আর প্রত্যাশা করতেও পারতেন না।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটা চমৎকার উক্তি রয়েছে। "পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে, যারা উদ্যমহীন, যারা কিছু পায় না, পেতে চায় না, তারা এ ব্যাপারে যে কোনও কিছু করবে। এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা তৎপর, যারা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আর তাতে মনোযোগ দিতে প্রস্তুত। এবং কিছু মানুষ রয়েছে যারা পদক্ষেপ নেয়, যারা সেটা বাস্তবে পরিণত করে। "এবং আমরা যদি আরও বেশি মানুষকে উৎসাহিত করতে পারি, সেটা হবে একটা আন্দোলন। আর যদি আন্দোলনটা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তা প্রকৃত অর্থে একটা বিপ্লব হবে। এবং সেটাই আমাদের প্রয়োজন।

অনেক ধন্যবাদ। (হাততালি) অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। (হাততালি)

সূত্র- ted-talk transcript

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সমাজের দায়িত্ব

আর্য যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের এক ধরনের দেশীয় শিক্ষা গড়ে ওঠে। এই সময়ে প্রচলিত গুরুগৃহ, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক দেশীয় ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। তখনকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও সমাজের দানশীল, বিদ্যোৎসাহী এবং প্রতিপত্তিশালীরা শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বেসরকারি উদ্যোগে অর্থায়ন, জমি দান করায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। দূরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক ও সমাজের ধনী ব্যক্তিরা নিজ গৃহে শিক্ষার্থীদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষকেরা নিজ ঘরে বা ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানা বা চণ্ডিমণ্ডপে শিক্ষকতা করতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আগে আমাদের দেশে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজস্ব সম্পদ, অর্থ, শ্রম ব্যয় করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারি হওয়ায় শিক্ষকদের বেতনভাতা নিশ্চিত হলেও বিদ্যালয়গুলো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে এবং সমাজের জনগণের বিদ্যালয়ে কোনও অংশগ্রহণ নেই বলে মনে করতে থাকেন। তখন আমাদের সমাজের জনগণ মনে করতে থাকেন বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির দায়িত্ব সরকার এবং শিক্ষকদের। ফলে বিদ্যালয় ও অভিভাবক তথা সমাজের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে লাগল। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষকসহ সব কর্মকর্তা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণ বাড়লেও গুণগত মান নিয়ে সবার মনে সংশয় আছে। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সাথে সমাজের জনগণের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা শিক্ষার্থীদের স্থানীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা দরকার। এজন্য সমাজের জনগণের অংশ নেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনগণের অংশ নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। আমাদের সমাজকে স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন হবে। কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে তাদের অংশীদারিত্বের মনোভাব সৃষ্টি করা। সমাজের জনগণ মনে করতে লাগল বিদ্যালয় ও শিশুকে দেখার জন্য সরকার ও শিক্ষকেরা আছেন। তবে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক থাকে। যেসব বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সক্রিয়, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক ভাল সেই সব স্কুলের ফলাফলসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক দিক ভাল। সমাজের সহযোগিতা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের সব কাজে জনগণের অংশ নেওয়া আবশ্যক। স্কুলের কোনও অনুষ্ঠানে অভিভাবককে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হলে তারা বিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক হবেন বলে আশা করা যায়। তাছাড়া গ্রামের পাড়া বৈঠক, স্কুলে বৈঠক করে তাদের শিশুদের পড়াশোনার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। তাদের ইতিবাচক মতামত গ্রহণ করলে তারা খুশি হয়। বিদ্যালয়ের সাথে সমাজের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারলে ছাত্রদের ঝরে পড়ার হার কমানো সম্ভব। এজন্য শিক্ষকেরা হোম ভিজিট করে ছাত্রদের স্কুলে আনার চেষ্টা করবেন। অসচেতন অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে তাদের বোঝাতে পারলে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আগ্রহী হবেন। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিসহ এলাকার বিদ্যোৎসাহী জনগণ ছাত্রদের ঝরে পড়া রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল এলাকায় শিক্ষকেরা নিয়মিত এবং সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকছেন কিনা তা ম্যানেজিং কমিটি বা সমাজের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা দেখতে পারেন। শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে তাদের অসুবিধাগুলো দূর করে তাদের সমস্যার সমাধান করা গেলে শিক্ষকেরা নিয়মিত ও সময়মতো স্কুলে আসতে পারেন। সমাজের জনগণ মনে করেন, সরকারি স্কুলের জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে বা নিজেরা বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের পরিবেশ শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য অনেক কর্মসূচি হাতে নেওয়া যায়। যেমন ফুলের বাগান ও বিভিন্ন বৃক্ষ রোপণ করা, বিদ্যালয় রঙ করা, শ্রেণিকক্ষগুলো বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করা। এক্ষেত্রে এলাকার বিভিন্ন পেশার, ধনবান ব্যক্তি, সাবেক ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে ব্যবস্থা করলে পাঠদানের পরিবেশ উন্নত হবে এবং শিক্ষার মান বাড়বে। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়গুলোতে একটা সুন্দর শিশুতোষ লাইব্রেরি তৈরি করা সম্ভব। শিক্ষকেরা একটু আন্তরিক হলে এলাকার গণ্যমান্য বিদ্যোৎসাহী সাবেক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে একটা সুন্দর লাইব্রেরি করতে পারেন। বিদ্যালয়ে যদি সহশিক্ষাক্রম কার্যাবলী না থাকে তাহলে শিশুরা বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এজন্য এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় সংস্কৃতিমনা লোকদের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যায়। শিশুদের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে আমন্ত্রণ জানালে অভিভাবকেরা বিদ্যালয়কে নিজেদের মনে করবে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করার সময় স্কুলের সাবেক ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার জনগণকে

আমন্ত্রণ জানালে বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের আন্তরিকতা বাড়বে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অগ্রগতি বা তাদের কোনও সমস্যা নিয়ে শিক্ষককে অভিভাবকদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা দরকার। এখানে যদি শিক্ষকেরা কোনও অভিভাবকের সাথে ভাল আচরণ করেন তাহলে স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের দায়িত্ববোধ বাড়ে। অভিভাবক স্কুলকে নিজের স্কুল মনে করতে পারেন। আর শিক্ষকেরা যদি অভিভাবক কিংবা এলাকার জনগণের সাথে ভাল ব্যবহার না করেন তাহলে অভিভাবক ও এলাকাবাসী স্কুলে তাদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করেন। বিদ্যালয়ের বিশেষ কোনও ঘটনার দিন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব অভিভাবককে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার জন্য অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানালে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিলে অভিভাবকদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে, এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উন্নয়নে পিতৃসুলভ সহায়তা দানে অভিভাবকেরা উৎসাহবোধ করবেন। অভিভাবকদের অংশ নেওয়া সম্ভব হলে, শিক্ষক, অভিভাবক সমিতি (পিটিএ) গঠনে অধিকতর উৎসাহ পাওয়া যাবে। সর্বোপরি আমরা বলতে পারি যে, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, সমাজের ধনবান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, সাবেক ছাত্রছাত্রী, শিশুদের মায়েরা, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য, বিভিন্ন পেশাজীবী, প্রবীণ ব্যক্তিরা যদি বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ, আন্তরিক হন তাহলে সেই এলাকার বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল হয়। আর এলাকার কোনও শিশু বড় হলে বা প্রতিষ্ঠিত হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে এলাকাবাসী। তাই এলাকাবাসীর উচিত এলাকার বিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের বিদ্যালয় বলে মনে করা। পরিশেষে বলা যায়, সমাজের জনগণের সহায়তা ছাড়া সরকার, শিক্ষক ও সরকারি কর্মকর্তাদের পক্ষে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা কঠিন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকেরা মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সমাজের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব বাড়লে শিশুরা মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

শিক্ষা হোক মূল্যবোধ বিকাশের সহায়ক

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষের মনোবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে এবং জীবনের সর্বপ্রকার বিষয়গত তথা বস্তুগত বিষয়াবলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। অর্থাৎ মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে শেখায়। মানুষ 'সৃষ্টির সেরা জীব' হলেও পরবর্তীতে জীবনের স্তরে স্তরে, পরতে পরতে, পথ চলতে চলতে, কখনও ঠেকায় পড়ে, কখনও দায়িত্ববোধ থেকে, কখনও নিজের প্রয়োজনে সে নিজেকে নিজে কিছুটা সৃষ্টি করে। আর নিজেকে নিজে এই সৃষ্টি করার যে পদ্ধতি তাই হল শিক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষের ভেতরে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করে, জাগ্রত করে জীবনকে, জগতকে এবং মানুষের ভেতরকার ঘুমন্ত বিবেককে। এর মধ্য দিয়েই মানুষের সুপ্ত বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটে। জাতির সামগ্রিক উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু বা চালিকাশক্তি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনও জাতি পৃথিবীতে উন্নতি করতে পারেনি। শিক্ষা হচ্ছে একজন মানুষের ভবিষ্যত পথা চলার প্রধানতম এবং অন্যমত চালিকাশক্তি। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততবেশি উন্নত। এজন্য নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, "তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" অবশ্য এখানে সুশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। যে শিক্ষা মানুষকে অমানবিক, আমানুষ ও পশুতে রূপান্তর করে সেই শিক্ষা নিশ্চয় কাম্য নয়। সম্প্রতি পরিবারে, সামাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে যেসব অপরাধ, অপকর্ম হচ্ছে তাতে শিক্ষিত এমনকি উচ্চশিক্ষিতদেরও জড়িয়ে পড়ার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। কোনও জাতির কাছে এরচেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর হয়না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন এবং গণসচেতনতা। শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভাগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষা শুধু জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্জিত জ্ঞানকে জীবনের সার্বিক প্রয়োজনে, কল্যাণকর কাজে লাগানোর মধ্যেই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জিত হয়। পাশাপাশি যে শিক্ষা মানুষের সুকুমারবৃত্তির ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষকে, দেশকে, প্রতিবেশীকে, পরিবার-পরিজনকে ভালবাসতে ও সম্মান বা মর্যাদা দিতে পথ দেখায় সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা কখনও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে জীবন ধারণের একটি সর্বোত্তম যোগ্যতা। সেক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক অর্থাৎ হাতে-কলমে শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। দেশের সব জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকার ও সমাজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে। গ্রামে অনেকেই এখন শিক্ষার আলো দেখতে পাচ্ছে। বয়স্কদের পাঠদানের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকল বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষাকে যথাযথভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জাতিকে শতভাগ শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক করে তোলার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

পরিবেশ ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের এক অনন্য উদ্যোগ

পরিবেশ শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে আজকের এই পৃথিবীতে। যে শিক্ষায় প্রথমেই থাকা দরকার জলের গুরুত্বের কথা। জলের নানাবিধ উৎসের পাশাপাশি জানতে হবে তা সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়। জলকে কীভাবে জীবন-জীবিকার নানা কাজে লাগাতে হয়। জানতে হবে তাও। শুধু জল নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকলেই হবে না, এই শিক্ষার মাধ্যমে শৈশব থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মনে গাছ সম্পর্কেও ভালবাসা তৈরি করতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে মানুষসহ সমগ্র প্রাণীকূলের অস্তিস্ব রক্ষায় গাছের অবদান অপরিসীম।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বা নতুন পাঠক্রমে পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি হাতে-কলমে বিভিন্ন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কর্মভিত্তিক পাঠ বা কৃত্যালির কথা। তাই শিশুমনে পরিবেশ ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে হলে জল, গাছ, মাটি ইত্যাদি নিয়ে আয়োজন করতে হবে হাতে-কলমে শিক্ষার।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর সহায়তায় একটি ২৮১ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেছে। গ্রামীণ জীবন-জীবিকায় জল ও গাছের গুরুত্ব বা তার ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে বইটি লেখা হলেও গ্রামীণ শিক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকার ক্ষেত্রেও এই বই যথেষ্ট উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। যদিও বইয়ের ভাষা বা বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রে ক্ষুদে পড়ুয়াদের পাঠের উপযুক্ত নয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিদের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বইয়ের নির্দিষ্ট অংশ পড়ে সহজ ভাষায় তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিবেশন করতে হবে। তবেই আগামীর মনে পরিবেশ বা তার চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব।

এই বইয়ে জল সংরক্ষণ বা তার ব্যবহারের নানান উপায়ের কথা বলা হয়েছে। জলবিভাজিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের উল্লেখ করতে গিয়ে এই বইয়ে জায়গা পেয়েছে ট্রেঞ্চ বা নানা ধরনের বাঁধ তৈরি কথা। আছে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্প্রিংশেড ডেভেলপমেন্টের কাজ। উল্লেখ রয়েছে মৎস্যচাষ বা উপকূল এলাকায় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজকর্ম, প্রাণীপালন, বিভিন্ন জৈব বা তরল সার তৈরি, গ্রামীণ পানীয় জল সংক্রান্ত কাজের জন্য সোকপিট বা রিজার্জ পিট তৈরি, গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধানে শৌচালয় বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, সেচ ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নানাবিধ কাজকর্মের কথা। এছাড়া পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের এই বইয়ে রয়েছে সুসংহত চাষ ও মুক্তোচাষ নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা।

'প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে-১০০ দিনের শতপথ' শীর্ষক এই বইটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল, এই বইয়ে জায়গা পেয়েছে শতাধিক গাছের এক অনন্য ভাণ্ডার। ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবিকায় গাছ কীভাবে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে মূলত সেই কথা মাথায় রেখেই এই বইটির যাত্রা শুরু। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বইয়ে এক-একটি গাছ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় জায়গা পেয়েছে, নির্দিষ্ট ওই গাছটির প্রসারণ বা বিস্তার কীভাবে সম্ভব, নার্সারীতে চারা তৈরি করার পদ্ধতি, গাছটি কী ধরনের মাটি বা আবহাওয়া সহ্য করতে পারে, চাষের জন্য কীভাবে তা মূল জমিতে রোপণ বা বপন করতে হয়, সার বা সেচ প্রয়োগ, রোগপোকার আক্রমণ বা তার প্রতিকার, ফসল সংগ্রহের সময়, ফসল সংগ্রহের পদ্ধতি বা তার পুষ্টিগুণ, ব্যবহার বা বাজারের মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১০০ দিনের কাজের আওতায় যে সব কৃষক বাণিজ্যিকভাবে এইসব গাছের চাষ করে লাভবান হতে চান তাদের কাছে বাংলায় সহজ-সরল ভাষায় লেখা এই বইটি নিঃসন্দেহে খুব কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

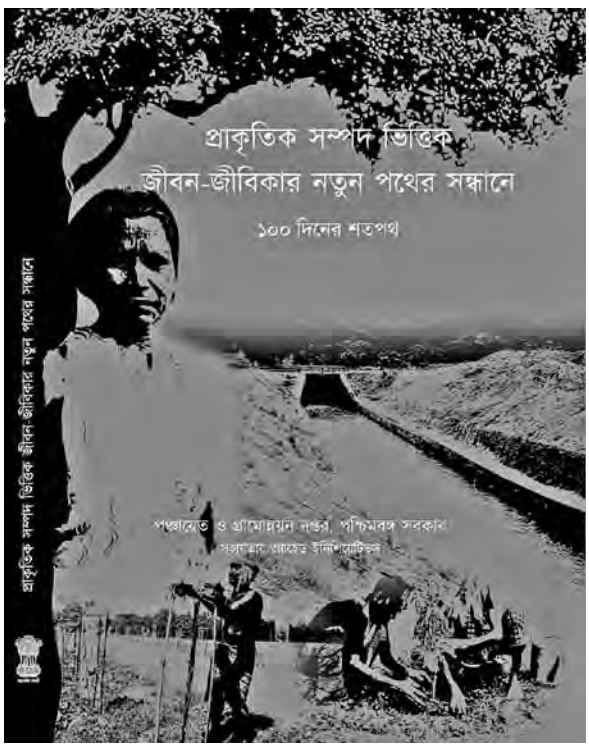

বইটি সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ৮৫৮৪০৭৪৫১২

তোতাকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক যে ছিল পাখি। পাখিটি হল তোতা পাখি। পাখিটা নিজের ইচ্ছেমত গান গাইত, লাফাত, উড়ে বেড়াত। কিন্তু পাখিটার কোনও শিক্ষা ছিল না। সে লিখতে পড়তে জানত না। এক কথায় বলা যায়, পাখিটা ছিল অশিক্ষিত, মূর্খ। ফলে সে কোনও নিয়মকানুনও জানত না। শুধু মনের আনন্দে গান গাইত আর উড়ে বেড়াত।

এই পাখিটাকে লক্ষ্য করে একদিন রাজা বললেন যে, এরকম মূর্খ ও অশিক্ষিত হলে তাকে তো কোনও কাজে লাগানো যাবে না।

রাজা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সত্যিই তো এমন অশিক্ষিত, মূর্খ পাখিটাকে নিয়ে কি করা যায়? মূর্খ পাখিটাকে তো কোনও কাজে লাগানোই যাচ্ছে না, বরং উল্টে বনের ফল খেয়ে রাজার লোকসান ঘটাচ্ছে।

তা এখন পাখিটাকে নিয়ে রাজা কি করবেন? রাজা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একসময় মন্ত্রীকে ডেকে রাজা বললেন, " মন্ত্রীমশাই, পাখিটার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।"

মন্ত্রীমশাই তো রাজার হুকুম অমান্য করতে পারেন না।

তাই রাজার হুকুম অনুযায়ী তিনি পাখিটার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। আর এই শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তদারকির জন্য প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হল রাজার ভাগ্নেকে।

প্রথমেই রাজ্যের সেরা পণ্ডিতদের ডাকা হল। পণ্ডিতরা বললেন যে পাখিটা মূর্খ এবং অশিক্ষিত তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পাখিটা কেন মূর্খ হল, কেন-ই বা অশিক্ষিত হল, তা আগে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ পাখিটার মূর্খ ও অশিক্ষিত হওয়ার কারণটা আগে জানতে হবে। তারপর পাখিটার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পণ্ডিতরা আলোচনায় বসলেন। পাখিটা কি কারণে মূর্খ ও অশিক্ষিত হল তা নিয়ে তাঁদের আলোচনা শুরু হল। আলোচনা করে পণ্ডিতরা জানালেন যে পাখিরা খড়কুটো দিয়ে ছোট ছোট বাসা বাঁধে, এরকম ছোট বা ক্ষুদ্র বাসায় শিক্ষা বা বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই পাখিটা কিছু শিখতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই

পাখিটা মূর্খ ও অশিক্ষিত থেকে গেছে।

এরপর পণ্ডিতরা পরামর্শ দিলেন যে প্রথমে পাখিটার জন্য একটা খাঁচা তৈরি করতে হবে। কিন্তু খাঁচাটি যেন অনেকটা বড় হয় এবং যেন শক্তপোক্ত হয়। খাঁচাটি অনেকটা বড় আকারের হলে তাতে বিদ্যা বেশি পরিমাণে ধরবে, আর খাঁচাটি শক্তপোক্ত হলে বিদ্যার ভারে সহজে ভেঙে যাওয়ার ভয়ও থাকবে না।

এবার পণ্ডিতদের পরামর্শ অনুযায়ী স্যাকরা ডাকা হল। রাজার আদেশ অনুসারে স্যাকরা বানিয়ে দিল একটি সোনার খাঁচা। আর সেই সোনার খাঁচা দেখার জন্য ছুটে এলো অসংখ্য মানুষ। তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই সোনার খাঁচা দেখার জন্য। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে পাখিটার এবার শিক্ষা হবে। আর কেউ কেউ এটাও বলল যে পাখিটার শিক্ষা যদি নাও হয় তাহলেও পাখিটার অসুবিধার কিছু নেই, সোনার

খাঁচা তো রইল, পাখিটা অন্তত সোনার খাঁচায় সুখে বসবাস করতে পারবে। পাখিটা সত্যিই ভাগ্যবান।

সোনার খাঁচা বানিয়ে দেওয়ার জন্য স্যাকরা এবং উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার জন্য পণ্ডিতের দলকে রাজা প্রচুর পরিমাণে বকশিস দিলেন এবং তাঁরা বকশিস পেয়ে খুব খুশি হলেন।

এরপর পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হল। পণ্ডিত বললেন যে পাখিটাকে শিক্ষা দিতে হলে প্রচুর পরিমাণে বইপত্র ও পুঁথির প্রয়োজন। পণ্ডিতের কথা অনুযায়ী প্রচুর বইপত্র ও পুঁথি জোগার করা হল। শুধু তাই নয়, নতুন করে অনেক পুঁথিও লেখা হল। সব মিলিয়ে মনে হতে লাগল যেন বইপত্র ও পুঁথির পাহাড়। আর এই বইপত্র ও পুঁথির পাহাড় দেখে অনেকেই বলতে লাগল, সাবাস, বিদ্যা আর ধরে না।

এখানেই শেষ নয়। যে সোনার খাঁচাতে পাখিটাকে রাখা হয়েছে, সেই সোনার খাঁচাটি রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখভাল করার জন্যও নিয়োগ করা হয়েছে বহু লোক। তারা কেউ সোনার খাঁচাটিকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে, কেউ বা সোনার খাঁচাটি পালিশ করে। আর তাদের কাজের উপর নজর রাখার জন্যও

লাগানো হয়েছে আরও বহু লোক। এই সমস্ত লোকজনেরা রাজার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মাইনে আর বকশিসও পেতে থাকল। আর তাদের এই কাজের ঘটা দেখে সাধারণ মানুষরা বলতে লাগল যে দেশের উন্নতি হচ্ছে বটে। যারা নিন্দুক তারা আরও বলতে শুরু করল যে খাঁচাটির উন্নতি হচ্ছে বটে কিন্তু পাখিটার কি হল, তার খবর কেউ রাখে না।

নিন্দুকদের এই কথা শুনতে পেয়ে রাজা তাঁর ভাগ্নেকে ডেকে পাঠালেন। ভাগ্নে বলে যে নিন্দুকেরা খেতে পায়না বলেই নিন্দা করে, মন্দ কথা বলে। ভাগ্নের এই কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হন এবং সন্তুষ্ট হয়ে ভাগ্নের গলায় পরিয়ে দেন সোনার হার।

তবু রাজার ইচ্ছা হয় যে পাখিটাকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা তিনি নিজের চোখে দেখবেন। যাই হোক, একদিন রাজামশাই পাখিটাকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা নিজের চোখেই দেখতে আসেন। আর রাজামশাই উপস্থিত হওয়া মাত্র

সেখানে যত কাজের লোক ছিল, যেমন মিস্ত্রি, মজুর, স্যাকরা সবাই মিলে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করে। আর পণ্ডিতরা শুরু করে জোর গলায় মন্ত্রপাঠ।

জয়ধ্বনি শুনে রাজা খুব খুশি হন এবং খুশি হয়ে রাজামশাই যেই হাতির পিঠে চাপতে যাবেন, অমনি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একজন নিন্দুক বেরিয়ে এসে বলে, " মহারাজ, পাখিটাকে দেখেছেন কি?"

নিন্দুকের কথা শুনে রাজা চমকে ওঠেন, সত্যিই তো, পাখিটাকে তো দেখা হয়নি।

রাজামশাই ফিরে আসেন পণ্ডিতের কাছে। রাজামশাই লক্ষ্য করেন যে পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আয়োজনের কোনও ত্রুটি নাই। অর্থাৎ পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার, পণ্ডিতরা তার সমস্ত রকম ব্যবস্থাই যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন।

রাজামশাই দেখলেন যে খাঁচায় দানাপানি নেই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি থেকে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে তা পাখিটার মুখের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পাখিটার গান গাওয়া তো বন্ধ হয়ে গেছে, আর চিৎকার করবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত নেই।

পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার এই ব্যবস্থা দেখে রাজামশাই তো খুব খুশি। এতটাই খুশি যে রাজামশাই আর কারও কথা শুনতে চান না। বরং রাজামশাই আদেশ দিলেন যে কেউ যদি নিন্দা করে তাহলে সেই নিন্দুকের যেন কান মলে দেওয়া হয়।

এদিকে এই অবস্থায় পাখিটা দিনে দিনে প্রায় আধমরা

হয়ে আসে। তবু স্বভাবদোষে মাঝে মধ্যেই ডানা ঝাপটায় আর চোখ মেলে আলোর দিকে চায়। এমনকি এক একদিন তার রোগা ঠোঁট দিয়ে খাঁচার তার কাটার চেষ্টাও করে। আসলে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার এই কাতর ও আপ্রাণ চেষ্টা। আর এই কাণ্ড দেখে পাহারাদার কোতোয়াল পাখিটার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে "একি বেয়াদবি।"

তারপর কোতোয়ালের দেওয়া খবর অনুযায়ী কামার এসে হাজির। কামার এসে পাখিটার জন্য তৈরি করে দিল শিকল, পাখিটার ডানাও কেটে দেওয়া হল, আর সেই সঙ্গে পাখিটাকে দেওয়া হল বেদম পিটুনি, যাতে পাখিটা আর কোনদিন পালাবার চেষ্টা না করে।

অবশেষে একদিন পাখিটা মারা গেল। খাঁচার মধ্যে পাখিটা কখন যে মারা গিয়েছে কেউ জানতেও পারেনি। নিন্দুকরা রটিয়ে দিল সেই খবর। রাজা নিন্দুকদের সেই রটনা শুনতে পেয়ে ভাগ্নেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাগ্নে, কী খবর?"

ভাগ্নে উত্তর দিলেন, "পাখিটার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে মহারাজ।"

রাজা ফের জিজ্ঞেস করলেন, "পাখিটা কি আর লাফায়?"

ভাগ্নে উত্তর দিলেন, "না আর লাফায় না।"

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "পাখিটা কি আর ওড়ে?"

ভাগ্নে উত্তর দিলেন, "না আর ওড়ে না।"

রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "পাখিটা আর কি গান গায়? দানা না পেলে আর কি চেঁচায়?"

ভাগ্নে উত্তর দিলেন, "না আর গান গায় না, দানা না পেলে আর চেঁচায়ও না।"

রাজা বললেন, "একবার পাখিটাকে নিয়ে এসো তো দেখি।"

রাজার আদেশ অনুযায়ী পাখিটাকে নিয়ে আসা হল। সঙ্গে এলো কোতোয়াল, পাইক বরকন্দাজ, ঘোড়সওয়ার আরও কত লোকলস্কর। সবাই মিলে পাখিটাকে ঘিরে দাঁড়াল। রাজাও ধীরে ধীরে পাখিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাজা পাখিটার শরীরে হাত দিলেন, পাখিটাকে টিপে টিপে পরখ করলেন, পাখিটা

তাতে হাঁ করল না, হুঁ-ও করল না। তার দেহটা পড়ে থাকল নিথর। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতাগুলোর খস খস, গজ গজ শব্দ শোনা গেল।

বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

"একুশ শতকে নিরক্ষর বলতে শুধু তাদেরকে বোঝায় না যারা পড়তে বা লিখতে জানে না, নিরক্ষর তারাই যারা শিখতে পারে না, মনে রাখে না এবং নতুন করে শেখে না" – অলভিন টফলার

সুখী মুক্ত মানুষের সন্ধানে শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সঙ্কট হচ্ছে মানবিকতা।

আমাদের শিখতে হবে সেই মানবিকতা যেখানে মানুষ হিসাবে আমরা সবাই পৃথিবীর সন্তান, একটা বড় পরিবার। সবাই শারীরিক, মানসিক ও আবেগগতভাবে আমাদের ভাইবোন। আমরা সবাই একইভাবে এই পৃথিবীতে এসেছি, আবার চলেও যাব একইভাবে। তবে কেন এতো হিংসা, ক্রোধ, রক্তপাত, হানাহানি? এর একটা বড় কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে শিক্ষা কেবল চাকরি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার শিক্ষা। চাকরি পেলে সুখে-সাছন্দে থাকবে, দামী গাড়ি, দামী বাড়ি, দামী আসবাবপত্র এসবেরই ভাবনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেই জন্যই শিক্ষা মানসিকভাবে বেশি করে বস্তুকেন্দ্রিক জীবনের স্বপ্ন দেখায়। বস্তুকেন্দ্রিক মূল্যবোধের ধারণাটা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানুষ হিসাবে ভালভাবে সুখী মুক্ত জীবনের রসদ দেয় না, প্রতিনিয়ত আমাদের যে চাপ, ভয়, হতাশা, ক্রোধের জন্ম দিচ্ছে তার সমাধান করতে পারে না। আমাদের শিক্ষার একটা দিক হচ্ছে, মানুষের ভেতরে বস্তুকেন্দ্রিক মূল্যবোধকে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া। হৃদয়ের ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে রয়েছে যে মানবিক মূল্যবোধ তার কোনও চর্চা হয় না। তাই এই শিক্ষা নেতৃত্ব দেয় অহং, ক্রোধ, হিংসার। যা দিয়ে একটা ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার তৈরি হয়, গঠনমূলক কিছু হয় না। তাই আজকের পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষের একে অপরকে খুন করতেও হাত কাঁপে না, খুন হয় ধর্মের নামেও। কেন এমনটা হয় ? বুঝতে হবে কোথায় আমাদের শিক্ষায় খামতি থেকে গেছে। মানুষ হিসাবে আমরা একে অপরকে করুণার চোখে দেখতে ভুলতে বসেছি। মনে রাখতে হবে, যে ধর্মের হোক, সম্প্রদায়ের হোক, জাতের হোক আমরা সবাই মানুষ, এই মানবিক বোধটাকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাগ্রত করতে হবে।

করুণা, প্রেম, আনন্দ মানুষের জীবনের বড় সম্পদ, আমাদের আত্মার আত্মীয়, শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে লালন করতে হয়।

সেই কারণেই শিক্ষার বিষয় নিয়ে খুব গভীরভাবে অন্তর দৃষ্টি দিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসে গেছে, তা না হলে আমাদের সুখী মুক্ত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষ হিসাবে আমাদের স্বভাব দু'ধরনের। এক ধরনে আছে হিংসা, রাগ, অহংকার। আর এক ধরনে রয়েছে করুণা, দয়া, মায়া, প্রেম, সবাইকে নিয়ে আনন্দে বাঁচা। শিক্ষাই পারে সবকিছু পরিবর্তন করতে, ভেতরের খারাপ দিকগুলোকে দমিয়ে রেখে ভাল দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা দেখাতে পারে।

তাই শিক্ষায় নৈতিকতাকে আগে স্থান দিতে হবে। নৈতিকতা হচ্ছে ধর্মের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নবদিশার পথিকদের প্রতি আবেদন

নবদিশার পথিক হয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রথমেই অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, এখনও পর্যন্ত নবদিশার ১১টি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নানান ত্রুটির কারণে হয়তো অনেক সংকলন আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছে, হয়তো বা আদৌ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরজন্য আমরা আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থণা করছি। তবে আমরা মনে করি, এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য অবিলম্বে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া যা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। আগামী দিনে যাতে এই নবদিশার এই পথ আরও সুগম হয় তারজন্য আপনারদের সুচিন্তিত মতামতের পাশাপাশি যথা সময়ে পথিক হিসাবে নতুনভাবে ধার্য হওয়া আপনাদের নির্দিষ্ট গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে পুর্ননবীকরণে সহায়তা করুন। এবার থেকে ডাকযোগে এই গ্রাহকমূল্য বছরে ২০০ টাকা এবং হাতেহাতে আপনার এলাকার চিহ্নিত কোনও কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বছরে ১০০ টাকা গ্রাহকমূল্য দিতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত আমাদের অন্য কোনও প্রকাশনা আত্মপ্রকাশ করলে তাও নবদিশার সংকলনের সঙ্গে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি নবদিশায় প্রকাশিত শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলো নিয়েও আপনাদের মতামত আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আপনাদের উপযুক্ত মতামতের মাধ্যমেই নবদিশার পথে এগিয়ে চলা সম্ভব। তাই হবে আমাদের পথ চলার পাথেয়।

আশা করি, এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সহযোগিতা পাব এবং নবদিশার পথে আমাদের যাত্রাপথ আগামীতে আরও সুগম হবে।

যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরেঃ 8584022177, 8584022181

সম্পাদক, নবদিশা, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্, কলকাতা

অন্য ভাবনার সৃজনের আসর

সৃজনের ছুটি, ছুটির সৃজন। পলাশের বনে বসে রয়েছে আমাদের ছুটি। আমাদের মননে, ভাবনায়, কর্মে যখন একটু একটু করে অভ্যাসের প্রাচীন ভাবনাগুলো দানা বাঁধতে শুরু করে আর প্রতিদিনের মরচে ধরা তলানির দিকে তাকিয়ে আমাদের জীবন নির্বাহ করতে হয় তখনই তো আসে ছুটির প্রহর। তখনই সদ্য সমাপ্ত বসন্তের গন্ধ মেখে শূন্য গ্রামগুলো প্রস্তুত হচ্ছে পুরুলিয়ার ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগোয়া অরণ্য-পাহাড় আচ্ছাদিত বাঘমুন্ডির গ্রামগুলোতে নীরব শূন্য বাতাসের ভিতর তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে একটানা ডাক।

এমনই এক সময়ে 'নবদিশা'র টেবিলে এসে পৌঁছলো একটা অসাধারণ সংবাদ। যা এই প্রবল ভাঙন আক্রান্ত সময়েও আমাদেরকে প্রাণিত এবং উজ্জীবিত করল নতুন করে একটা দীর্ঘ স্বপ্ন দেখার প্রস্তুতি নিতে। আমরা জানলাম, বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দুটি চক্রসম্পদ কেন্দ্রের ১১টি বিদ্যালয়ে দু'দিন করে বসেছিল ছুটির আনন্দ পাঠের আসর। 'নবদিশা'র গ্রামীণ বন্ধুদের প্রতিবেদনে জানলাম প্রধানত দু-তিন ধরনের সক্রিয়তার ওপরে ভিত্তি করে সেখানকার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ মেতে উঠেছিল নতুন ধরনের সৃজনের অতলান্ত আনন্দে।

তাদের আসরে ছিল গল্পপাঠ আর গল্প শোনা। যেখানে এই আসর পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অদ্ভুতভাবে অনুভব করলেন, যে শিশুরা তাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলো নিয়ে এতকাল অনাগ্রহ দেখিয়ে এসেছে আজ তারাই অত্যন্ত মনোযোগে আর অনন্ত উৎসাহ নিয়ে শুনছে ঈশপের গল্প, বিভূতিভূষণের ছোট গল্প, রতনতনু ঘাটীর কবিতা এবং শুধু তাই নয়, তাদের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যেন সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছে মহান সাহিত্যের সৃষ্টিগুলো। আমরা অবাক হয়ে শুনলাম প্রতিদিনের তুলনায় এই আসরে উপস্থিতির হার ছিল অনেকাংশে বেশি এবং যা আমাদের কাছে সবচেয়ে ইতিবাচক বলে মনে হয়েছে তা হল, ৩টি বিদ্যালয়ে আম-সংক্রান্ত একটি কৃত্যালিতে যখন অভিভাবকবৃন্দ অংশগ্রহণ করে এবং অনেকটা তাদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানেই শিশু-কিশোররা সৃষ্টি করে তাদের নিজস্ব আমের নার্সারী। যেখানে এখনও তাদের প্রতিদিনের অনির্বাণ যত্ন আর উষ্ণ পাহারায় বেড়ে উঠছে আমের চারাগুলো। প্রতিদিনের পরিচিত বিদ্যালয়ে দু'দিনের ছুটির শিবিরে যেন বিষাদমুক্তি ঘটেছে ছেলেমেয়েদের, গান, গল্প, গাছ, নৃত্যের এই আয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছেন, সৃজনের নতুন উৎসমুখ খুলে দেওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে প্রতিদিনের পাঠ্য নির্ঘন্টের মধ্যে থাকতেই পারে এই কর্মকাণ্ডগুলো। কিন্তু যদি প্রসারিত করা যায় দিগন্ত তবেই আসবে নতুন প্রহর।

মূদ্রণের জন্য যখন এই লেখাটি প্রস্তুত করছি তখন আরও একটি সংবাদ পাওয়া গেল সুন্দরবনের গোবিন্দকাটী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। সেখানেও নাকি দু'দিন ধরে সৃজনের ছুটির আনন্দে মেতে উঠেছিল মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা। সেখানেও ওই আসরে প্রাধান্য পেয়েছিল স্থানীয় প্রেক্ষিতে লেখা, মহৎ সাহিত্যের পাঠ এবং বীজ–জল–মৃত্তিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন করা।

সামনেই আবার শরৎ-হেমন্ত আসছে, নতুন চেতনার পথ বেয়ে আসছে ছুটিতে সৃজন-আসরের নতুন পরিকল্পনা।

হুমকির মুখে পরিবেশ

হুমকির মুখে উদ্ভিদকূল
উজার বনভূমি
উষ্ণ হচ্ছে পরিবেশ
নষ্ট হচ্ছে জমি।

হঠাৎ করে অতি বৃষ্টি
উল্টো আবার খরা
প্রয়োজনে বৃষ্টি বাদল
দেয় না যেন ধরা ।

এসব কিছু প্রকৃতির এক
খাম-খেয়ালি বটে
বৃক্ষ ধরায় কমে গেলে
এমনটি রোজ ঘটে ।

না থাকলে গাছ-গাছালি
যতটুকু কাম্য
প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে
নিজেরই ভারসাম্য ।

গাছ লাগিয়ে করতে হবে
সবুজের সমাবেশ
বাঁচবে তবে পরিবেশ আর
বাঁচবে আমার দেশ ।

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

কনফুসিয়াস

(৫৫১ – ৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ইয়াং হুয়ান্যিন রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

এক মাষ্টারমশাইয়ের ভাবনা–চিন্তা–দর্শন হয়ে উঠল এক বিশেষ সংস্কৃতি-সভ্যতার উৎস। পৃথিবীর মানচিত্রে তৈরি হল "কনফুসিয়ান সংস্কৃতি এলাকা।" চিন, কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনামের মতো কয়েকটি দেশজুড়ে তৈরি হল এই এলাকা। এই দেশগুলির প্রথা–ঐতিহ্যে মিশে আছে কনফুসিয়ান বোধ। তাদের সাংস্কৃতিক আর শিক্ষার ইতিহাস তৈরি হয়েছে কনফুসিয়ান ধারণায়।

সাগর-পাহাড় পেরিয়ে চিনের কনফুসিয়াস বাতাস ঢুকে পড়েছিল এই দেশগুলির মাটিতে ঠিক যখন তাদের সমাজে ঘটছিল কোনও না কোনও পালাবদল। হয় সেখানে আদিম সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছিল দাসপ্রথার সমাজে, না হয় দাসপ্রথার জায়গায় তৈরি হচ্ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। তাই-ই হয়েছিল কোরিয়া-জাপান-ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের দিনে কনফুসিয়ানিজম ঢুকে পড়ল। আজ থেকে প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে কোরিয়া আর ভিয়েতনামে কনফুসিয়াসের মতবাদ পৌঁছে যায়। আর কোরিয়া হয়ে তাঁর ভাবনা পৌঁছে যায় জাপানে। ভিয়েতনাম থেকে কনফুসিয়াসের দর্শন গিয়ে পৌঁছয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও একগুচ্ছ দেশে। কনফুসিয়াসকে ভিত্তি করে এই সব দেশে তৈরি হয় তাদের জাতীয় প্রথা-ঐতিহ্য।

কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনামের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যখন তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বদল ঘটছিল, তখন দেশগুলিতে না ছিল লিখিত ভাষা (লিপি), না ছিল বইপত্র প্রকাশনার ব্যবস্থা। কনফুসিয়ান ধ্যান-ধারণার প্রয়োগের ফলে কনফুসিয়াসের লেখা রচনাগুলির হাত ধরে ওই দেশগুলির ভাষায় ব্যবহৃত হল চাইনিজ লিপি চিহ্নগুলি, প্রকাশিত হল বইপত্র। চাইনিজ ধারায় বসল স্কুল ব্যবস্থা। ১৬০০ শতকে জেসুইট মিশনারীদের হাত ধরে কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা গিয়ে পৌঁছয় ইউরোপে। সেখানে তখন শুরু হয়েছে মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়া শ্রেণির জাগরণ। স্বৈরাচার আর দৈবের দোহাই দিয়ে শাসনতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার তোড়জোড় চলছে। সে সময়ের ইউরোপিয়ান দার্শনিকেরা কনফুসিয়াসের লেখায় তাঁদের মতামতের সমর্থন খুঁজে পান। রাজনীতিতে নৈতিকতা, অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব, দর্শনে নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি কনফুসিয়াসের ধারণাগুলি ইউরোপিয়ানদের প্রভাবিত করে।

এতদিন অভিজাত ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারে ছিল শিক্ষা। রাজনীতি আর অর্থনীতির গাঁথনিতে "প্রশাসনের জন্য আর প্রশাসনের দ্বারা শিক্ষা"-কে বেঁধে রাখা ছিল। সামন্ততন্ত্রের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাতে সেই ভিত গেল নড়ে।

একটা মজার ধারা লক্ষ্য করা যায়। জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে যখন কনফুসিয়ানিজম পৌঁছয়, তখন সেই দেশগুলিতে চলছিল ভয়ানক আলোড়ন, উত্থান। দেখা যাচ্ছে, যে সময়ে কনফুসিয়াসের মনে চিন্তা-ভাবনা-দর্শন দানা বাঁধছে, তখন তাঁর চারপাশে চলছে ভয়ানক আন্দোলন, পরিবর্ত্তনের ঢেউ। দীর্ঘদিনের জাও রাজবংশের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে তৈরি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সময়টা ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। বহু বিদ্যার অধিকারী কনফুসিয়াস এই পরিবর্তনকে কাজে লাগান। এতদিন অভিজাত ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারে ছিল শিক্ষা। রাজনীতি আর অর্থনীতির গাঁথনিতে "প্রশাসনের জন্য আর প্রশাসনের দ্বারা শিক্ষা"-কে বেঁধে রাখা ছিল। সামন্ততন্ত্রের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাতে সেই ভিত গেল নড়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতি জনগণের বিষয় হয়ে উঠতে থাকল। কনফুসিয়াস সময়ের স্রোতে ভেসে চললেন। তৈরি করলেন স্কুল, যেখানে ধনী, দরিদ্র সব্বাই সমানভাবে পড়াশোনা শিখবে। কনফুসিয়াস খুলে দিলেন শিক্ষার দরজা, সকলের জন্য। "আমার শিক্ষা সকলের জন্য– এখানে কোনও প্রভেদ নেই"। আর সেই থেকে অতীত চিনে সর্বজনীন শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়ে গেল। আর এরসঙ্গে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক সংস্কার আর সংস্কৃতির বিস্তার। আর তখন কতই বা বয়স তরুণ কনফুসিয়াসের। ৩০ বছর বয়সেই ৩০০০ শিষ্য-পড়ুয়া ভিড় করে তাঁর স্কুলে। এদের মধ্যে ৭২ জন ছয়টি কলায় (আচার-প্রথা, সঙ্গীত, ধনুর্বিদ্যা, রথ-চালনা, হস্তাক্ষরবিদ্যা ও গণিত) বিশারদ হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য সে যুগে এই ছয়টি কলা ছিল শিক্ষালাভের বিষয়। কনফুসিয়াস পরিচালিত স্কুলের শিক্ষারীতি, পঠন-পাঠনের মান, ভর্তি হওয়ার ধরণ– সব কিছুই অদ্বিতীয় ছিল। কনফুসিয়াসের মতে, সমাজ ও ব্যক্তি বিকাশে শিক্ষা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার দুটি কাজ- ১) নৈতিক নির্দেশনা ও ২) বুদ্ধির বিকাশ। শিক্ষার হাত ধরে যে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পায়

তার মূলে রয়েছে একটি সদ্গুণ–মানবতা। কনফুসিয়াসের কাছে মানবতার আর এক নাম সদাশয়তা। এই গুণটিই মানব সম্পর্কের আরও নানান গুণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, যেমন – শ্রদ্ধা, মহানতা, ধৈর্য, প্রাজ্ঞতা, করুণা, সাহস / শৌর্য, পরোপকার, অমায়িক আচরণ, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। এতসব কিছুর উৎসে রয়েছে সদাশয়তা। গুণের প্রভাবে মানুষ একে অন্যের প্রতি আন্তরিক হয়ে ওঠে, পারস্পরিক সহানুভূতি দেখায়। একে অন্যের খেয়াল রাখে। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। ব্যক্তির মধ্যে এই সদাশয়তার চর্চা হওয়া দরকার, আর তা হবে শিক্ষার হাত ধরে। এই শিক্ষার হাত ধরে ব্যক্তি-পরিবারের শান্তি সদ্ভাব ছড়িয়ে পড়বে সমাজে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ থাকবে নিরাপদে। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করবে। ব্যক্তির নৈতিক মানে উন্নতি সাধিত হলে সমাজেও নৈতিকতা উন্নত হয়। এমনটাই বিশ্বাস করেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শিক্ষক সমাজ ও রাজনৈতিক নেতারা। শিক্ষার প্রভাবে দেশে দেশে শান্তি আসে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

শিক্ষার দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ– সে বিষয়েও কনফুসিয়াস সমান গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে সংস্কৃতিবোধ, দক্ষতা ও সার্মথ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর জন্য তিনি ছয়টি ম্যানুয়েল লিখে গেছেন। প্রত্যেকটি রচনায় সমাজ সম্পর্ক ও নৈতিকতার সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের চর্চা করা হয়েছে– দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সঙ্গীত চর্চা। সামন্ততান্ত্রিক চিনের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ম্যানুয়েলগুলো ২০০০ বছরের বেশি সময় ধরে বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করেছে, যা ১৯১৯–এর ৪ঠা মে-র আন্দোলনে প্রথম ধাক্কা খায়। রাজনৈতিক ও নৈতিক নীতির উপর ভর করে থাকা কনফুসিয়ান শিক্ষাতত্ত্বের মূল লক্ষ্য "গুণের মানুষ" তৈরি করা। শিক্ষাক্রমে সেই সব বিষয় স্থান পেয়েছে যা সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করবে নাগরিক পরিষেবার দক্ষতাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ্য আধিকারিক। তাই ছয়টি কলার (আচার-প্রথা, সঙ্গীত, রথ-চালানো, ধর্নুবিদ্যা, হস্তাক্ষরবিদ্যা ও গণিত) চর্চা গুরুত্ব পেয়েছিল। কৃষিকাজ, বাণিজ্য ও কায়িক শ্রম কনফুসিয়ান পাঠক্রমে স্থান পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়টি কোনওক্রমে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় সুশাসনকে নিশ্চিত করতে কনফুসিয়াসের নীতি ছিল যোগ্য লোক বেছে নেওয়া। তাই শুরু হয়েছিল কর্মচারী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা। এই ব্যবস্থার ফলে বংশগত পরম্পরায় উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার প্রাচীন আভিজাত্যপূর্ণ প্রথাটি বিলুপ্ত হয়। চিনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই নিয়ম যুগান্তকারী বলে গণ্য করা হয়। দেশে দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যোগ্যতাভিত্তিক কর্মনিযুক্তি ও যোগ্যতা এবং নৈতিকতা অর্জনের লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আজও চিনদেশে বিশ্বাস হারায়নি।

কনফুসিয়াসের শিক্ষানীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ছিল- ১) পড়ুয়ার শ্রবণতা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ২) পড়ুয়াকে শিখতে উৎসাহিত করা, সাহায্য করা, ৩) ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ৪) অন্যকে শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজে শেখা, ৫) বর্তমানকে অতীতের আলোয় বিচার করতে শেখা, ৬) শিক্ষককেও পড়তে হবে, জানতে হবে– পড়তে ভালবাসতে হবে, ৭) তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগ-চর্চাকে মেলানো, ৮) স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দেওয়া, ৯) নিজের ব্যক্তিগত আচরণ শিক্ষানীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কিনা পরখ করে নেওয়া, ১০) পড়ুয়ার বয়স অনুসারে শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করা, ১১) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-বিশ্লেষণ করতে শেখা, ১২) ভাল উদাহরণ হিসেবে নিজেকে পেশ করা, ১৩) নিজের ভুল শোধরানো, নিজের বিকাশ ঘটানো, ১৪) মন্দকে খর্ব করে শুভ/ভালকে প্রকটিত করা, ১৫) ভুল সংশোধনকে মুক্ত মনে গ্রহণ করতে শেখা, ১৬) সমালোচনাকে গ্রহণ করতে পারা, ১৭) অতীতের ভুল বোঝাবুঝি, সম্পর্কের মলিনতাকে ভুলে গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া

এই নীতিগুলো কনফুসিয়াস ভাবনা-চিন্তা করে তৈরি করলেও প্রতিদিনের জীবনচর্চার মাধ্যমে সেগুলোকে ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তো হয়ে উঠেছিলেন এক প্রবাদপ্রতিম মাষ্টারমশাই। শিক্ষক মানুষটাকে কেমন হতে হবে? কনফুসিয়াসের এবিষয়ে স্পষ্ট মত ছিল। শিক্ষক হবেন বিবেকবান, সেই সঙ্গে থাকতে হবে অদম্য আবেগ। পড়ুয়ার উপকারে লাগতে হলে শিক্ষকের জ্ঞানের পরিসীমা বিস্তৃত হতে হবে, যথেষ্ট দখল থাকতে হবে। পড়ুয়াকে ভালবাসতে হবে, তাদের মনের নানান চলন, বিশিষ্টতা সম্বন্ধে শিক্ষককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। পাঠ্যবস্তুকে, জ্ঞানের বিষয়টাকে পড়ুয়ার কাছে পৌঁছে দিতে শিক্ষককে নানান উপায় বা পন্থার কথা ভাবতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে, যা পরবর্তীতে যথাযথ পদ্ধতিতে রূপ নেবে। পড়ুয়ার উন্নতি, বিকাশই হল শিক্ষকের ব্রত। শিক্ষকদের থাকতেই হবে রাজনৈতিক প্রত্যয়। শিক্ষক হবেন বিনয়ী, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এক মানুষ। নিজের জ্ঞানকে তিনি জাহির করবেন না। শিক্ষক হবেন নিঃস্বার্থ। নিজেকে প্রকাশ করবেন প্রাণবন্তভাবে, চমৎকারভাবে। কথার সঙ্গে কাজের থাকবে মিল, শিক্ষক হবেন ন্যায়পরায়ণ। মজার কথা, কনফুসিয়াস অর্থনীতিকে শিক্ষার উপরে স্থান দিয়েছেন। সুশাসনের লক্ষণ–সবার আগে দেশের স্বচ্ছলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তার সঙ্গে থাকবে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি।

এই নীতিগুলো কনফুসিয়াস ভাবনা-চিন্তা করে তৈরি করলেও প্রতিদিনের জীবনচর্চার মাধ্যমে সেগুলোকে ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তো হয়ে উঠেছিলেন এক প্রবাদপ্রতিম মাষ্টারমশাই।

নিজের জীবদ্দশায় কনফুসিয়াস শিক্ষক হিসেবে তাঁর লক্ষ্যগুলি পূরণ করে যেতে পারেননি। কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী সময় জুড়ে চিনের সংস্কৃতি ও শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর অবদান অপরিসীম। সে অবদান ছড়িয়ে গেছে বিশ্বের অনেক দেশে।

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

তাঁকে চেনেন না এমন মানুষ দুই বাংলায় খুব কমই আছেন। তাঁকে নিয়ে রয়েছে নানান মজার কাহিনি। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ সালে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ছাত্র জীবনেই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে অসামান্য ভূমিকা ছিল তাঁর। বহু বিবাহ রোধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। বর্ণ পরিচয়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ। ১৮৯১ সালে এই মৃত্যু হয় এই মানুষটির।

বিদ্যাসাগর চরিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের সময় তাঁর বাবা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পাশের গ্রামে হাটে গিয়েছিলেন। ছেলেকে এই সুসংবাদ জানাতে উৎফুল্ল ঠাকুরদা ছুটলেন হাটের দিকে। পথের মধ্যেই ছেলের সাক্ষাৎ পেয়ে বললেন, "আমাদের একটি এড়ে বাছুর হয়েছে।" সে সময় বাড়িতে একটি গরু ছিল, তারও দু'একদিনের মধ্যে প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। তা বিনা দ্বিধায় বিদ্যাসাগরের বাবা সে কথা বিশ্বাস করে বাড়িতে ঢুকেই গোয়াল ঘরের দিকে চললেন। তখন বিদ্যাসাগরের দাদু ছেলেকে থামিয়ে রহস্যের হাসি দিয়ে "ওদিকে নয়, এদিকে এসো, আমি তোমাকে এড়ে বাছুর দেখিয়ে দিচ্ছি" বলে সূতিকাগৃহে নিয়ে গিয়ে সদ্যজাত ছোট্ট ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন। পরে এই ঘটনা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, "পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন। তাহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে। আমি যে ক্রমেই এড়ে গরু অপেক্ষাও একগুয়ে হইয়া উঠিতেছিলাম তাহা বাল্যকাল হইতেই আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

"বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, "বুঝেছি, রথ দেখা এবং কলা বেচা দু'টোই হবে। ম্যাপ দেখানোও হবে। আবার প্রয়োজন হলে ছেলেদের পিঠে দু'ঘা বসানোও যাবে। কী বলেন ?"

শ্লোক রচনা

তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সেদিন ছাত্ররা ক্লাসে পড়ছিল। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রদের বললেন, "গোপালয়ে নমোহস্তু তে" এবং বাক্যটি দিয়ে চতুর্থ চরণের একটি শ্লোক রচনা করতে বলেন। বিদ্যাসাগর বাক্যটি শুনেই রসিকতা করে বললেন, "এক গোপাল তো দেখছি আমাদের সামনেই রয়েছেন, আর এক গোপাল বহুকাল আগে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। কোন গোপালের বর্ণনা করব ?" ছাত্রের এই বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্গত প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক জয়গোপাল খুশি হলেন। হেসে বললেন, " বেশ বৎস, আপাতত বৃন্দাবনের গোপালেরই বর্ণনা কর।"

সরস্বতীর স্তব

আর একবার ওই একই অধ্যাপক সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ছাত্রদের একটি শ্লোক লিখতে বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখলেন, লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতাম যস্যাঃ প্রসাদনে, ফলারমাপ্লুমঃ সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম।

রথ দেখা কলা বেচা

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। সাধারণত তিনি ছাত্রদের শারীরিক শাস্তিদান পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায়ই ক্লাস চলাকালীন টহল দিয়ে বেড়াতেন। একদিন দেখলেন, এক অধ্যাপকের টেবিলের উপর একটি বেত রাখা। তিনি অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে ক্লাসে বেত নিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। অধ্যাপক বললেন, "ম্যাপ দেখানোর সুবিধার জন্য ওটি নিয়ে গিয়েছি। "বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, "বুঝেছি, রথ দেখা এবং কলা বেচা দু'টোই হবে। ম্যাপ দেখানোও হবে। আবার প্রয়োজন হলে ছেলেদের পিঠে দু'ঘা বসানোও যাবে। কী বলেন ?" একথা শুনে অধ্যাপক মাথা হেট করে রইলেন।

অবতার

একদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এক গোড়া ব্রাহ্মণ দেখা করতে আসেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই এই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন না। এই ব্যবহারে ব্রাহ্মণ অপমানিত বোধ করলেন। অপমানের জ্বালা মেটাতে উপস্থিতদের লক্ষ্য করে বললেন, "এইসব অর্বাচীনদের মনে রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ। এক সময় তারা দেশ ও ধর্মের কল্যাণসাধন করেছেন। তাঁরা সব সময় সকলের প্রণম্য।" একথা শুনে বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, "পণ্ডিত মশাই, শ্রীকৃষ্ণ একদিন বরাহরূপ (শূকরের চেহারা) ধরেছিলেন বলেই কী ডোমপাড়ায় যত শূকর আছে, তাদের

প্রণাম করতে হবে ?"

মাথা খাওয়া

বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে ঈশানচন্দ্র এবং বড় নাতি অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। ফলে বাড়ির অন্য কেউ তাদের শাসন করার খুব একটা সাহস পেতেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্যাসাগর পিতৃদেবের মুখোমুখি হলেন। অনুযোগের স্বরে বললেন, "বাবা আপনি না নিরামিষাশী ? অথচ আপনি দু'বেলা ঈশান আর নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন !"

"আমরা মরলে কিছুদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে তারপর স্বর্গে যাব। কিন্তু তুমি এখন নরক ভোগ করবে। ফলে মরার পর সরাসরি স্বর্গে যাবে।"

স্বর্গবাস

কোনও এক সাব-জজ প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়ে করলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে বললেন, "তোমার তো মরার পরেই স্বর্গবাস !" এ শুনে ওই সাব-জজ বলেন," কেন ?" তখন বিদ্যাসাগর বলেন, "আমরা মরলে কিছুদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে তারপর স্বর্গে যাব। কিন্তু তুমি এখন নরক ভোগ করবে। ফলে মরার পর সরাসরি স্বর্গে যাবে।"

বই ও শাল

একবার এক সম্ভ্রান্ত লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় শখ ছিল বই পড়া এবং সেগুলো যত্ন করে বাঁধাই করে রাখা। একাজে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করতেন। ভদ্রলোক বইগুলো দেখে বললেন, "এরূপ এত খরচ করে বইগুলো বাঁধিয়ে না রাখলেও হত।" এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর বলে, " কেন? এতে দোষ কী ? তখন ভদ্রলোক বলেন, " ওই টাকায় অনেকের উপকার হতে পারত।" বিদ্যাসাগর তামাক খেতে খেতে ভদ্রলোকের শাল লক্ষ্য করে বললেন, "আপনার শালটি চমৎকার। কোত্থেকে, কত দিয়ে কিনেছেন?" শালের প্রশংসা শুনে ভদ্রলোক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "শালটি পঁচিশ টাকায় খরিদ করা।" বিদ্যাসাগর সুযোগ পেয়ে বললেন, "পাঁচ সিকের কম্বলেও তো শীত কাটে, তবে এত টাকার শালের প্রয়োজন কী? এই টাকায়ও তো অনেকের উপকার হতে পারত।"

"হোয়্যার ইজ মাই কোট?" বিদ্যাসাগর নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, ইওর কোট হ্যাজ গন ট্যু ব্রিং মাই চাদর।"

ছাই

ইংরেজ রাজদরবার থেকে বিদ্যাসাগর নতুন উপাধি পেয়েছেন। একথা শুনে এক পল্লীগ্রামের শিক্ষক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মশাই, নতুন উপাধিটার মানে কী?" বিদ্যাসাগর বলেন, "সি-আই-ই।" শিক্ষক বলেন, "তাতে কী হল?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ত্বরিত জবাব। "ছাই!"

পরিবেশন

বিদ্যাসাগর নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। অতিথিকে পরিবেশন করার সময় প্রায়ই বলতেন,-

" হু হু দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে
শিরসি চালনে দেয়াং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।"

মনের ময়াম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার গ্রামের এক স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছেন। সেখানে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে খেতে বসে রান্নার বিশেষ প্রশংসা করতে লাগলেন। সে সময় ওই গ্রামেরই এক ধনী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পরদিন বিদ্যাসাগরকে নিমন্ত্রণ করে নানারকম চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সহকারে আপ্যায়ন করলেন। বিদ্যাসাগর খাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু রান্নার প্রশংসা করছেন না দেখে হতাশ ধনী গৃহকর্তা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রান্না কেমন হয়েছে? ভাল হয়েছে তো?" বিদ্যাসাগর বলে ওঠেন, " ভালই, তবে ময়াম কম হয়েছে।" ভদ্রলোক অবাক হয়ে জানতে চান, "কীসের ময়াম?" বিদ্যাসাগর এবার মুচকি হেসে বলেন, "মনের ময়াম।"

বিষ্ঠা সমাচার

বিদ্যাসাগর একদিন গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটছিলেন। পথের মধ্যে সমবয়সী একজন রসিকতা করে বললেন, "পণ্ডিত মানুষ, আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছো। দেখো পায়ে আবার বিষ্ঠা না লাগে!" বিদ্যাসাগর রসিকতার জবাবে বললেন, "এগ্রামে বিষ্ঠা আসবে কোত্থেকে? এখানে তো দেখছি সবই গোবর।"

ব্রিং মাই চাদর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিন ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। সহযাত্রী এক ইংরেজ যুবক বিদ্যাসাগরের বেশভূষা দেখে ভীষণ চটে গেল। বিদ্যাসাগর একসময় বাথরুমে গেলে সাহেব তাঁর ময়লা চাদর জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন। ফিরে এসে বিদ্যাসাগর চাদর খুঁজে না পেয়ে সবই বুঝলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর ইংরেজ যুবক তার কোটটি রেখে বাথরুমে গেলে বিদ্যাসাগরও একই কাজ করলেন। ফিরে এসে সাহেব নিজের কোটি যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়্যার ইজ মাই কোট?" বিদ্যাসাগর নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, ইওর কোট হ্যাজ গন ট্যু ব্রিং মাই চাদর।"

পয়সার গরম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খদ্দরের চাদর পরতেন। শীত বা গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন গায়ে শুধু চাদর আর কাঠের খড়ম পরেই সংস্কৃত কলেজে ক্লাস নিতে যেতেন। মাঘ মাসের শীতের সময় প্রতিদিন সকালে এভাবে ঈশ্বরচন্দ্রকে ক্লাস নিতে যেতে দেখে প্রায়ই হিন্দু কলেজের এক ইংরেজ সাহেব যাওয়ার পথে বিদ্যাসাগরকে ক্ষ্যাপানোর জন্য বলতেন, "কীহে, বিদ্যার সাগর,

বিদ্যার ভারে বুঝি ঠাণ্ডা লাগে না তোমার?" বিদ্যাসাগর প্রতিদিন কথা শুনতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। একদিন শীতের সকালে ঠিক একইভাবে তিনি ক্লাস নিতে যাচ্ছিলেন। পথের মাঝে আবার সেই ইংরেজের সাথে দেখা। আবার সেই একই প্রশ্ন। এবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ট্যাঙর থেকে একটা কয়েন বের করে বললেন, " এই যে গুজে রেখেছি, পয়সার গরমে আর ঠাণ্ডা লাগে না। এবার হল তো?"

কথার প্যাঁচ

এক বিয়েবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেখা হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের পায়ে যথারীতি সেই তালতলার শুড়তোলা চটি। বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেখে ঠাট্টা করে বললেন, "মহাশয় আপনার চটির শুড় তো বেঁকে ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে। শেষ পর্যন্ত আকাশে গিয়ে না ঠেকে!" এই রসিকতার জবাবে বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, "কী আর করা যাবে বল! জানোই তো, চটি যত পুরনো হয় ততই বঙ্কিম হয়ে উঠতে থাকে।"

এই রসিকতার জবাবে বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, "কী আর করা যাবে বল! জানোই তো, চটি যত পুরনো হয় ততই বঙ্কিম হয়ে উঠতে থাকে।"

আকার

এক গরিব ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্যের জন্য এসেছেন। "আজ্ঞে আমি পাঠশালায় ছাত্র পড়াতাম। জমিদারের শয়তানিতে চাকরি গেছে। বড়ই দুরাবস্থায় আছি।" বিদ্যাসাগর শুনেই বললেন, "আপনার যে চাকরি থাকবে না তা দুরবস্থার আ-কার দেখেই বুঝতে পারছি।"

তুলনা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর্থিক অনটনের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। একদিন এক মাতাল বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চাইতে এলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, "আমি কোনো মাতালকে সাহায্য করিনা। এ শুনে ওই মাতাল বলে, "কিন্তু আপনি তো মধুসূদনকে সাহায্য করেন। তিনিও তো মদ্যপান করেন।" মাতালের যুক্তি শুনে বিদ্যাসাগর তাকে শর্ত দিয়ে বলেন, "ঠিক আছে, তুমি ওঁর মতো 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখে আনো, তোমাকেও সাহায্য করব।"

বিদেশি মাল

একদিন সকালে বৈঠকখানায় বসে লেখালেখি করছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল পাড়ার এক মাতাল ব্রাহ্মণ। তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেন, "বাবা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, গরিব মানুষকে দশটা টাকা দাও, একটু দেশি মাল কিনে খাই।" বিদ্যাসাগর বলে ওঠেন, "দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। আমি কোনও মাতালকে টাকা দিই না।"

উত্তরে মাতাল ব্রাহ্মণ বলে, "তুমি তো মাইকেল মধুসূদনকে নিয়মিত টাকা দাও। সেই টাকা দিয়ে সে বিদেশি মাল খায়, আর আমি দেশি মাল খাব তাও তুমি টাকা দেবে না?" এবার বিদ্যাসাগর বলেন, "তোমাকেও দিতুম, যদি তুমি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মতো একটা বই লিখতে পারতে!"

সূত্র- বাংলাদেশের জনৈক প্রবন্ধকারের লেখা থেকে সংগৃহীত

গ্রামীণ শিক্ষায় নবদিশা

নবদিশা মনে করে, গ্রাম হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ গবেষণাগার। বিশেষ করে সেই শিক্ষা যখন হয়, পরিবেশ নির্ভর হাতে-কলমে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। যেখানে শিখে ছাত্রছাত্রীরা নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং তা নিয়ে নিজেরা নিরন্তর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত থাকবে। গ্রামের প্রবীণ মানুষেরাই হচ্ছেন গ্রামের অতীত সময়ের সাক্ষী, স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে। শিক্ষা হয়ে উঠুক আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক, যে শিক্ষা গুরুত্ব দেবে মানুষের মৌলিক চাহিদাকে এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই পথ চলছে নবদিশা।

আসলে সমাজকে গড়তে হলে আগে সেই সমাজের মানুষ গড়ার আয়োজন করতে হবে। আর সেই মানুষ গড়ার আয়োজনই হল আসল শিক্ষা। কোনও কিছু শেখাই শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, সমগ্র জীবন ও জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন করার নামই শিক্ষা বলে বিশ্বাস করে নবদিশা।

সেই সময়

প্রায় দেড়শ বছর আগে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থটি লিখেছিলেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট ২০ টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তে তৎকালীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও জেলার ভৌগলিক বিবরণ সহ সেখানকার অধিবাসীদের জীবন জীবিকা ও তাদের আর্থ-সামাজিক চিত্র, নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যেভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন বাংলার জেলাভিত্তিক যে পরিচয় আমরা পাই – তা আজও প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার সেই পুরনো দিনগুলির দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখন দেখা যাক, কেমন ছিল সেই সময়।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার উত্তরে ছিল বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ সাব-ডিভিশন এবং রাণীগঞ্জ সাব-ডিভিশন ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যবর্তী সীমারেখা হিসেবে ছিল দামোদর নদ। বাঁকুড়া জেলার পূর্ব দিকে ছিল সোনামুখী, কোটালপুর ও ইন্দাস থানা (এই স্থানগুলি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান জেলায় স্থানান্তরিত হয়েছিল), দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল মেদিনীপুরের গড়বেতা সাব-ডিভিশন এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল মানভূম জেলা। অন্যভাবেও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব দিকে বাংলার সমভূমি এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড় ও উচ্চভূমির মধ্যে একটা যোগসূত্র হল এই বাঁকুড়া জেলা। এই জেলার সদর শহরও ছিল বাঁকুড়া শহর। বাঁকুড়া শহরটি ছিল ঢলকিশোর নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী, এই জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫২৬,৭৭২ জন। আয়তন ছিল ১৩৪৬ বর্গ মাইল। এই জেলার মোট জনসংখ্যার যে হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে তা বিস্তৃত ছিল ২০২৮টি গ্রাম ও শহরে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এই সেনসাস অনুযায়ী, মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ১০৪,৬৮৭ টি। প্রতি বর্গ মাইলে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৩৯১ জন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এই সেনসাস রিপোর্টে বাঁকুড়া জেলায় ৫টি পুলিস সার্কেল বা থানা এলাকার নাম পাওয়া যায়। এই পাঁচটি থানা এলাকা হল – বাঁকুড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর অথবা বিষেণপুর, ছাতনা এবং গঙ্গাজলঘাটি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, বাঁকুড়া থানা এলাকার আয়তন ছিল ৫৫ বর্গ মাইল, বাড়ির সংখ্যা ছিল ৭,৯৪৪ টি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৯,০৮০ জন। ওন্দা থানা এলাকার আয়তন ছিল ৩০৮ বর্গ মাইল, বাড়ির সংখ্যা ছিল ২৩,৯৭৩টি এবং মোট জন সংখ্যা ছিল ১২১, ৩৬১ জন। বিষ্ণুপুর বা বিষেণপুর থানা এলাকার আয়তন ছিল ২৫৫ বর্গ মাইল, বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩০,৮১৬টি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪৭,২৫২ জন। ছাতনা থানা এলাকার আয়তন ছিল ২২৮ বর্গমাইল, বাড়ির সংখ্যা ছিল ১১,২৬৯টি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৪,০১৫ জন। গঙ্গাজলঘাটি থানা এলাকার আয়তন ছিল ৫০০ বর্গমাইল, বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩০,৬৮৫টি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫৫,০৬৪ জন। আর গোটা বাঁকুড়া জেলা হিসেবে প্রতি বাড়ি পিছু জনসংখ্যার গড় হিসেব ছিল ৫ জন এবং প্রতি বর্গমাইল হিসেবে বাড়ির সংখ্যা ছিল ৭৮টি। কিন্তু থানা এলাকা হিসেবে বাঁকুড়া থানা এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে বাড়ির সংখ্যা ছিল গড়ে ১৪৪টি এবং বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে বাড়ির সংখ্যা ছিল গড়ে ১২১টি। অর্থাৎ ৫টি থানা এলাকার মধ্যে একমাত্র বাঁকুড়া থানা এলাকাতেই প্রতি বর্গমাইলে গড় হিসেব অনুযায়ী বাড়ির সংখ্যা ছিল বেশি। তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিষ্ণুপুর থানা এলাকা।

বাঁকুড়া জেলা হিসেবে মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২৬১,৬৯০ জন এবং মহিলার সংখ্যা হল ২৬৫,০৮২ জন। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা হিসেব অনুযায়ী পুরুষের হার ছিল ৪৯.৭% এবং মহিলার হার ছিল ৫০.৩ % । এই জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ধর্মের মানুষের সংখ্যা ছিল মোট ৪৮৭,৭৮৬ জন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ছিল মোট ১৩,৫০০ জন, খ্রিস্ট ধর্মের মানুষের সংখ্যা ছিল মোট ৭০ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষরা হলেন মোট ২৫,৪১৬ জন। শতকরা হিসেবে হিন্দু ধর্মের মানুষরা হলেন ৯২.৬%, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা হলেন ২.৬% । তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষদের বসবাসের কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

তৎকালীন বাঁকুড়া জেলার মোট জনসংখ্যার হিসেব অনুযায়ী মিঃ হান্টার মহিলা ও পুরুষদের সেই সময়কার পেশাগত বিবরণও দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, মহিলা ও পুরুষদের পেশা বা জীবিকা মোট সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। মিঃ হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী, যে সব পেশাকে প্রথম শ্রেণিতে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো হল সরকারি অথবা মিউনিসিপ্যাল বিভাগে চাকরি, সরকারি পুলিশ, গ্রামীণ পুলিশ অথবা ভিলেজ ওয়াচম্যান, সাব-অর্ডিনেট জুডিসিয়াল অফিসার, সাব-অর্ডিনেট এগজিকিউটিভ অফিসার, এডুকেশনাল অফিসার, পাবলিক ওয়ার্কস অফিসার, পোস্ট অফিস ক্লার্ক ইত্যাদি। এই প্রথম শ্রেণির জীবিকা বা পেশায় ১৮৩৪ জন পুরুষের সংখ্যা পাওয়া গেলেও মহিলাদের সংখ্যা শূন্য। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির পেশায় পুরুষের সংখ্যা ৪০৩১ জন এবং মহিলার সংখ্যা ১৭২ জন। এই ১৭২ জন মহিলার মধ্যে স্কুল মিস্ট্রেসের সংখ্যা ৩ জন, নার্সের সংখ্যা ৪৪ জন, মহিলা ডাক্তারের (মহিলা কবিরাজ) সংখ্যা ১১ জন, গায়িকা ৩ জন, নৃত্যশিল্পী ২ জন, চিত্রশিল্পী ১ জন। পেশা অনুযায়ী সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত এই পেশাগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পেশাগুলো হল – পুরোহিত, ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী এবং ভবিষ্যৎবাণী প্রদানকারী, মোহান্ত, পূজারী, স্কুল শিক্ষক, সংস্কৃত শিক্ষক (পণ্ডিত), সংস্কৃত স্কুল অথবা টোলের শিক্ষক (অধ্যাপক), মুন্সী, অ্যাটর্নি, স্ট্যাম্প বিক্রেতা, কবিরাজ, গরুর ডাক্তার অথবা গোবৈদ্য, কম্পাউন্ডার, গায়ক, চিত্রশিল্পী, আমিন, ঝাড়ুদার, মাহুত, গোমস্তা, ইজারাদার, হকার, দালাল, সওদাগর, দর্জি, দপ্তরী, মৎস্যজীবী, দুধ বিক্রেতা, ধোপা, দারোয়ান, খুচরো বিক্রেতা বা ব্যাপারী প্রভৃতি।

তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে যে শ্রেণিভেদের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই অনুযায়ী মিঃ হান্টার তাঁর বিবরণে ৮৩টি শ্রেণীর (caste) উল্লেখ করেছেন। পেশাগত বা জীবিকা অনুসারেও এই শ্রেণীগুলি (caste) গঠিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। Mr. C. F. Magrath-এর District Census Compilation of Bankura থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মিঃ হান্টার উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল মোট ৪৯৪৭৩ জন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী, তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯৭ জন, কায়স্থের সংখ্যা ছিল ১১৬৭৬ জন। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় আগরওয়ালা ও মারোয়াড়ীর সংখ্যা ছিল ৭৯ জন, কিন্তু এঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় পাখি ধরা বা শিকারির সংখ্যা ছিল ১৭ জন।

তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে যে শ্রেণিভেদের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই অনুযায়ী মিঃ হান্টার তাঁর বিবরণে ৮৩টি শ্রেণির (caste) উল্লেখ করেছেন।

তৎকালীন বাঁকুড়া জেলার প্রধান শহর ছিল বাঁকুড়া। এখান থেকেই জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা হত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে একটি সেনসাস করা হয়েছিল, তাতে এই শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫,৩৪৬ জন, কিন্তু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী এই শহরের মোট জনসংখ্যা হয় ১৬,৭৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৮৬৯৫ জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৮০৯৯ জন। এই শহরের প্রধান বিল্ডিংগুলো ছিল সরকারি কোর্ট, চার্চ, জেল, ট্রেজারি, পোস্ট অফিস এবং সরকারি স্কুল ইত্যাদি। সরকারি স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ২২২ জন। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলার আর একটি অন্যতম শহর হল বিষ্ণুপুর। দেশীয় রাজার অধীন বিষ্ণুপুর শহরটি ছিল জেলার প্রাচীন রাজধানী। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী, বিষ্ণুপুর শহরে মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ৪০০৭টি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮,০৪৭ জন। এই শহরে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাসের তথ্য পাওয়া গেলেও খ্রিস্ট ধর্মের মানুষদের বসবাসের তথ্য পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঘুনাথ সিং। তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের নিকট জয়নগরের রাজার বংশধর। রঘুনাথ সিং-ই ছিলেন বিষ্ণুপুরের প্রথম রাজা। ইতিহাসে তিনি বাগদীদের রাজা বলে খ্যাত। বিষ্ণুপুরের রাজাদের ইতিহাস রচনা করেছিলেন রাজা গোপাল সিং, সেই ইতিহাস বাঁকুড়া কালেক্টরেট ভবনে পাওয়া গিয়েছিল।

তৎকালীন বাঁকুড়া জেলার কৃষি বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দুই প্রকার ধান চাষের কথা জানা যায়। যেমন আমন ও আউস ধান। এর মধ্যে ২১টি ধরনের আমন ধানেরও কথা জানা যায়, যেগুলো তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় চাষ করা হত। দু'ধরনের আউস ধানের কথাও জানা যায়। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় সরষে, তিল, মাসকলাই, অড়হর, মটর, ছোলা প্রভৃতি ফসলেরও চাষ হত। এছাড়াও নীল, আখ, পান ইত্যাদি চাষের কথাও জানা যায়। এসময় কৃষি শ্রমিকরা, যারা অন্যের জমিতে কাজ করত, তাদের এক বছরে আয় ৩০ টাকা থেকে ৩৬ টাকা। ছুতারদের আয় ছিল দিনে ৩ আনা থেকে ৫ আনা। কুলি ও কৃষি শ্রমিকরা দিনে আয় করত ২ আনা পর্যন্ত।

বাঁকুড়া জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ছিল একমাত্র খরা। তৎকালীন কালেক্টরের তথ্য অনুযায়ী, কম বৃষ্টিপাতের কারণেই এই খরা দেখা দিত। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে যে খরা হয়, তাতে বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে চালের দাম ছিল প্রতি টাকায় ১৫ সের, ওই একই বছরের অগাস্ট মাসে তা হয় প্রতি টাকায় ৬ সের। খরার পাশাপাশি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর শহরে কলেরাও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এর কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের অভাবকেই দায়ী করা হয়। ফলে এসময় কলকাতা থেকে বাঁকুড়া জেলায় চাল আমদানি করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য সময়ে বাঁকুড়া জেলার চাহিদা বজায় রেখে উদ্বৃত্ত চাল জেলার বাইরেও রফতানি করা হত। বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলা থেকে চাল রফতানি করা হত হুগলী এবং মেদিনীপুরে। চাল ছাড়াও তৈলবীজ, লাক্ষা, সিল্কের কাপড় ইত্যাদি রফতানি করা হত। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ছিল বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর শহর এবং রাজগ্রাম ও বড়জোড়া। কিন্তু

বাঁকুড়া জেলায় কোনও সংবাদপত্র বা ছাপাখানা ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় ছিল গভর্নমেন্ট ইংলিশ স্কুল, গভর্নমেন্ট ভার্নাকুলার স্কুল, সেই সঙ্গে ছিল সাহায্যপ্রাপ্ত ইংলিশ স্কুল ও ভার্নাকুলার স্কুল। আর ছিল সাহায্যপ্রাপ্ত গার্লস স্কুল।

১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট ইংলিশ স্কুল ছিল মাত্র একটি। আর সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মোট ২১৫ জন। সাহায্যপ্রাপ্ত ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯টি। মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৬২৯ জন। সাহায্যপ্রাপ্ত গার্লস স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪টি এবং মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ১০৫ জন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে গার্লস স্কুলের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩টি এবং পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ১০২ জন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৭টি এবং শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মোট ১১১ জন। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মোট ৩৩১৬ জন। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৭টি এবং শিক্ষকের সংখ্যাও ছিল ৫৭ জন। এই বিদ্যালয়গুলোতে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মোট ১৫৯১ জন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সর্বমোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩৪টি এবং পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মোট ৪৭২৪ জন।

তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় মাত্র তিনটি হায়ার স্কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্কুল তিনটি ছিল বাঁকুড়া গভর্নমেন্ট স্কুল, কুচিয়াকোল স্কুল এবং অযোধ্যা স্কুল। ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে ২২২ জন পড়ুয়ার সংখ্যা হলেও ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে তা কমে দাঁড়ায় ১৮৬ জন। পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে, ওয়েসনিয়ান মিশনারিদের দ্বারা মিডল ক্লাস ইংলিশ স্কুল সে সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় এলাকায় কলেরা এবং চিকেন পক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। যাইহোক, এই ১৮৬ জন পড়ুয়ার মধ্যে ১৮১ জন ছিল হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, মুসলমান ধর্মের ছিল ৪ জন এবং ১ জন ছিল খ্রিস্ট ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। আরও জানা যায় যে, ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এই হায়ার স্কুলগুলো যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পেরেছিল। বাঁকুড়া গভর্নমেন্ট স্কুলের ২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন এই ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পায় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের স্কলারশিপ লাভ করে, বাকিদের মধ্যে ৭ জন সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করে, আর ৭ জন থার্ড ডিভিশনে পাশ করে। অকৃতকার্য হয় ১০ জন ছাত্র। অযোধ্যা স্কুলের ৭ জন পড়ুয়ার মধ্যে ২ জন থার্ড ডিভিশনে পাশ করে, বাকি ৫ জন অকৃতকার্য হয়। হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে, বাঁকুড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে অন্য ২ টি হায়ার স্কুলের তুলনায় শিক্ষার খরচ ছিল অনেক বেশি। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে জানা যায় যে, তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় বাঁকুড়া চ্যারিটেবিল ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও একটি ডিসপেনসারি। এছাড়াও তৎকালীন বাঁকুড়া জেলায় বেশ কিছু কবিরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ভেষজ ঔষধি প্রয়োগ করার মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি পাউডারের নাম, যা গঙ্গাধরচূর্ণ বলে উল্লেখিত হয়েছে। বেল, পানিফল, বেদানা, আদা, ক্যাপসিকাম, চিরতা, ভাং ইত্যাদি আরও অনেক কিছু মিশিয়ে এই গঙ্গাধরচূর্ণ তৈরি করা হত। ভেষজ ঔষধি তৈরিতে কবিরাজরা আরও যেসব উপাদান ব্যবহার করতেন সেগুললো হল- শতমূলী, আকন্দ, নিমের ছাল, মহানিম, অর্জুন ছাল, গামার ছাল, ধুতুরা, জাইফল, বাসক ছাল, খেজুর, তাল, মেথি, আমলা ফল ও পাতা, বাবলা ছাল, হরিতকী, বহেড়া, বন কুন্দরী, নাগেশ্বর ফুল, আদা প্রভৃতি। হান্টারের বর্ণনায় মোট ৬৯ ধরণের ভেষজ উপাদানের কথা জানা যায়।

বন্ধ হোক দূষণ, সবুজে ঢাকুক স্কুল চত্বর

বড় বড় কলকারখানা, গগনচুম্বী অট্টালিকা, নগরায়নের স্বার্থে ক্রমশ চলছে প্রকৃতি সংহার। অবাধে চলছে গাছ কাটা। আকাশে-বাতাসে বেড়েই চলেছে দূষণের মাত্রা। দূষণের গ্রাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে অভূতপূর্ব রায় দিল্লির জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল প্রিন্সিপাল বেঞ্চের। আদালতের নির্দেশ স্কুল ক্যাম্পাসগুলোকে দূষণমুক্ত রাখতে ব্যাপক পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। এবং এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, উদ্যানপালন বিভাগ, পঞ্চায়েত, পুরসভা ও স্কুলশিক্ষা দফতরকে পদক্ষেপ করতে হবে।

আদালতের এই নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতর সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলোতে গ্রিন বেল্ট তৈরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যের এধরনের সমস্ত স্কুলে গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলোর পক্ষ থেকে স্কুলশিক্ষা দফতরকে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি জানিয়েছেন, সাত-আট বিঘা জমির উপর প্রতি বছর স্কুলের তরফে বৃক্ষরোপণ করা হয়। তাছাড়া নিয়মিত বাগানও করা হয়। ফুল, ফল, পাতাবাহারের গাছ যেমন সেখানে আছে তেমনই লাগানো হয়েছে শাল, সেগুন, মেহগনির মতো গাছও। মালিদের পাশাপাশি স্কুলের পড়ুয়ারা নিয়ম করে এইসব গাছপালার যত্ন নেয়।

সূত্র – এই সময়, সোমবার ২ এপ্রিল ২০১৮

মজার মজার ইশকুল

বিশ্বে কিছু আদর্শ স্কুল রয়েছে। সাধারণ পাঠদানের বাইরে নানাভাবে এসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। কোথাও শিক্ষার্থীদের পুরো স্কুল নদীতে ভেসে বেড়ায়, কোনও স্কুলে নেই বইখাতা সামলানোর ঝক্কি, আবার কোনও স্কুলে হয়তো শিক্ষক-ই নেই, যে যার মতো যা খুশি করছে।

কোনও কোনও শিক্ষার্থীর আবার বিশ্বজোড়া একটি পাঠশালা। এরপরও এসব স্কুল নজর কেড়েছে পুরো বিশ্বের। কোনও কোনও স্কুল পেয়েছে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও। এমনই কয়েকটি মজার স্কুলের গল্প তুলে ধরা হল এখানে,-

নৌকা স্কুল

বাংলাদেশে 'নৌকা স্কুল' পদ্ধতিতে ১৪ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষার প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে 'সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা'। প্রতিষ্ঠানটি ভাসমান স্কুল, পাঠাগার, ল্যাপটপ, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকার ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়েছে, যাদের বেশির ভাগই সুবিধা বঞ্চিত। এই স্কুলে সৌরচালিত বিদ্যুৎও রয়েছে। বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বছরজুড়ে শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিত করে হাজারো মানুষের জীবন বদলে দেওয়ায় ভারতে পুরস্কৃত হয়েছেন 'নৌকা স্কুলের' উদ্ভাবক স্থপতি মোহাম্মদ রেজোয়ান। তিনি ভারতের মর্যাদাপূর্ণ 'শ্রী সত্য সাঁই অ্যাওয়ার্ড ফর হিউম্যান এক্সেলেন্স-২০১৬' পেয়েছেন।

নৌকা স্কুলে হাস্যোজ্জ্বল শিক্ষার্থীরা
ছবি: সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে নেওয়া

প্রতীকী ছবি: এ.এফ.পি.

ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি

সবখানেই এখন প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। পাঠদানের পদ্ধতিতেও পড়েছে এর প্রভাব। যুক্তরাজ্যের সেভেনোয়াস্ক স্কুলে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি বা ভি.আর. প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। এই স্কুলে শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠ দেওয়া হয়।

গ্রিন স্কুল

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অবস্থিত এই গ্রিন বা সবুজ স্কুল। এখানে পড়ানোর উপকরণসহ স্কুলের অবকাঠামো সবকিছুই বাঁশ দিয়ে তৈরি। নার্সারি থেকে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। পরিবেশগত দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এখানকার শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। এই স্কুলের তিনটি মূল নীতি হল— স্থানীয় বলে ভাবা, পরিবেশের দিকে নজর দেওয়া ও আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা।

গ্রিন স্কুলের বাঁশের ছাউনির নিচে শিক্ষার্থীরা
ছবি: গ্রিন স্কুলের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

স্কুলে মেরি-গো-রাউন্ড খেলে ব্যাটারি চার্জ করছে শিক্ষার্থীরা
ছবি: এমপাওয়ার প্লেগ্রাউন্ডসের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

অন্ধকারের আলো

ঘানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। এসব অঞ্চলের শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে প্রায় বঞ্চিত। দিনের বেলা স্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে আর অন্ধকারে পড়ার উপায় থাকে না তাদের। এ কারণে 'এমপাওয়ার প্লেগ্রাউন্ডস' নামে একটি স্কুল চালু হয়েছে। এই স্কুলের মাঠে রয়েছে একটি মেরি-গো-রাউন্ডসের রাইড। এই রাইডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি ব্যাটারি। দিনের বেলায় শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজ হল স্কুলে এসে যতক্ষণ খুশি মেরি-গো-রাউন্ড খেলা। আর এতে ওই ব্যাটারি চার্জ হবে। এই ব্যাটারি দিয়ে রাতের বেলা স্কুলে বাতি জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। ব্যাটারি একবার চার্জ হলে ৪০ ঘণ্টা একটা বাতি জ্বলতে পারে।

কাগজবিহীন স্কুল

কাগজ ও টেবিলবিহীন স্কুলের কথা ভাবা যায়! না গেলেও কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু স্কুলে এখন কাগজ ও টেবিলের ব্যবহার তুলে দিয়েছে। কলম-কাগজের বদলে জায়গা হয়েছে আইপ্যাড ও কম্পিউটারের। শিক্ষার্থীরা এখানে গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে পড়া উপস্থাপন করে। এসব স্কুলে চক বোর্ডের পরিবর্তে স্মার্ট বোর্ড ব্যবহার করা হয়।

প্রতীকী ছবি: এএফপি

স্কুলে যে যার মতো বসে পড়ছে শিশুরা
ছবি: স্টিভ জবস স্কুলের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

ইচ্ছেমতো পড়

নেদারল্যান্ডসের স্টিভ জবস স্কুলে নির্দিষ্ট কিছু পড়ার বাধ্যবাধকতা নেই। শিশু-কিশোরেরা এখানে যে যার মতো বিষয় নির্বাচন করে পড়তে পারে। কেউ বসে, কেউ শুয়ে আবার কেউ বা ঘুরতে ঘুরতে পড়তে পারে এখানে। বই পড়তে না চাইলেও সমস্যা নেই। সহপাঠীরা মিলে হেলদোল করে গল্পে মশগুল বা খেলতেও পারে তারা। তবে এই স্কুলে সব শিক্ষার্থীকেই একটি করে আইপ্যাড দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে জোহানেসবার্গে এরকম আরও একটি স্কুল চালু করা হয়েছে।

ছেলেমেয়ে নেই ভেদাভেদ

সুইডেনের স্টকহোমে ইগালিয়া প্রিস্কুলে কখনোই 'হি' ও 'শি' শব্দটি শেখানো হয় না। এই স্কুলে ছেলেরা পুতুল নিয়ে খেলে আর মেয়েরা গাড়ি।

শিশুদের বইপত্রে লিঙ্গবৈষম্যমূলক কোনও বিষয় নেই। সতর্কতার সঙ্গে বই থেকে সেগুলো বাদ দেওয়া হয় এই স্কুলে।

ইগালিয়া প্রাকস্কুলে খেলছে শিশুরা
ছবি: সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে নেওয়া

রোবট শিক্ষক পিপারের সঙ্গে কথা বলছে এক শিক্ষার্থী
ছবি: এ.এফ.পি.

রোবট যেখানে শিক্ষক

সিঙ্গাপুরে গত বছর পাইলট প্রকল্পের আওতায় একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে রোবট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ওই রোবট শিক্ষকের নাম পিপার। পিপার শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। প্রাক-স্কুলের শিক্ষার্থীদের গল্প শোনাতে পারে এই রোবট। যেসব শিক্ষার্থী একটু লাজুক, কম মিশতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে রোবট শিক্ষক খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে। লাজুক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ করে তাকে হাসি-আনন্দে রেখে কাজ আদায় করে নিতে পারে। শিক্ষার্থীরাও সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে রোবট শিক্ষককে বেশি পছন্দ করেছে।

বুনো স্কুল

ডেনমার্কে প্রাক-স্কুলের খুদে শিক্ষার্থীরা বনের ভেতর পড়াশোনা করে। ড্যানিশ ফরেস্ট অ্যান্ড নেচার এজেন্সির তথ্যমতে, দেশটির ১০ শতাংশ প্রাক-স্কুল বনের ভেতর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক আবহের মধ্যে অবস্থিত। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বনের ভেতর নিয়ম করে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাদের প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ানো হয়। স্কুলের পড়াশোনার সব উপকরণও বনের ভেতর থেকে নেওয়া।

বুনো স্কুলের আনন্দে মেতে পড়ুয়ারা
ছবি: এ.এফ.পি.

দ্য থিংক গ্লোবাল স্কুলের শিক্ষার্থীরা
ছবি: দ্য থিংক গ্লোবাল স্কুলের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বিশ্বজোড়া পাঠশালা

যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কের দ্য থিংক গ্লোবাল স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে পুরো বিশ্বটাই যেন একটি স্কুল। প্রতি সেমিস্টারে তাঁরা একেকটি দেশে পড়াশোনা করেন। নতুন নতুন দেশের ভাষাও শিখতে হয় তাঁদের। পড়াশোনার অংশ হিসেবে নতুন দেশের একদম স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশতে হয় শিক্ষার্থীদের। সেসব দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও জানতে হয় তাঁদের। এই স্কুলের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থীদের ভারত, বতসোয়ানা, জাপান ও স্পেনের যেতে হবে।

সূত্র: http://www.prothom-alo.com/international/article/1347331

"শিক্ষদের তিনটি ভালবাসার জায়গা রয়েছেঃ শিখনের ভালবাসা, শিক্ষার্থীর ভালবাসা, এবং এই প্রথম দুই ভালবাসাকে একত্রে নিয়ে চলার ভালবাসা"- স্কট হেডেন

পরিবেশ শিক্ষায় হাতে-কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। বদলাচ্ছে পরিবেশ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা। আমরা শুধু কিনছি, কিনছি আর কিনছি, কোনওরকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই উৎপাদন করে চলেছি। এমনটা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এই অবস্থায় আশঙ্কা একটাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা না ভেবে আমরা যেন আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করে না ফেলি। এরজন্য প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব মানসিকতা। তাই শৈশব থেকে স্কুলগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে পরিবেশ শিক্ষার ওপর। আর স্কুলের এই পরিবেশ শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে হাতে-কলমে অর্থাৎ কর্মভিত্তিক এবং আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক। ছাত্রছাত্রীদের জানতে হবে তার চারপাশ ও মাটি সম্পর্কে।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেশে স্কুল পাঠক্রম তৈরি হয় কেন্দ্রীয়ভাবে। তাই বইয়ের পাঠ্যসূচি সবক্ষেত্রে একই ধরনের হয়ে থাকে। যদিও আজ সামান্য হলেও ভাবনার বদল ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যই তাদের মতন করে পাঠক্রমে কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করছে। খুব যথাযথভাবে না হলেও, আমাদের রাজ্য পাঠক্রমে জায়গা দিয়েছে পরিবেশের মতো বিষয়টিকে। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, যেমন আমাদের পরিবেশ বিষয়ক বইয়ে উল্লেখ রয়েছে কৃষিকাজে ফসলের পোকা দমন করতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ওই বইয়ে এর ব্যাখ্যা নেই যে, কীটনাশক ব্যবহার করলে কতটা ফসল বেশি পাওয়া যাবে, ফসল কতটা সুরক্ষিত থাকবে এবং এই কীটনাশক ব্যবহারের কুফল কী বা পরিবেশের ওপর তার কতটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

আবার আমাদের বিজ্ঞানের বইয়ে রয়েছে গাছ লাগানো জরুরি। বলা হয়েছে গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। কিন্তু কোথায় কী ধরনের গাছ লাগালে ভাল হয় তার কোনও ধারণা দেওয়া হয়নি। উল্লেখ নেই, অঞ্চলভিত্তিক কোথায় কোন গাছ পরিবেশের পক্ষে উপযোগী হতে পারে। অর্থাৎ কোন প্রজাতির গাছ কোন পরিবেশে লাগানো উচিত, কোথায় তার বীজ পাওয়া যেতে পারে বা কীভাবে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বাচ্চাদের জানতে হবে তাদের অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে। আর শুধু বই পড়ে এসব বোঝা সম্ভব নয়। তাই পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি প্রয়োজন হাতে-কলমে দক্ষতা বৃদ্ধি, তবে হবে তা সঠিক পরিবেশ শিক্ষা। নিচে একটি উদাহরণ দিয়ে এই হাতে-কলমে পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল;-

বীজ ভাণ্ডার তৈরির কর্মভিত্তিক পাঠ (কৃত্যালি)-

উদ্দেশ্য - ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রজাতির বীজের সঙ্গে পরিচয় করানো ও বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলা

কর্মভিত্তিক পাঠ - ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের (ফল, ফুল, সবজি, খাদ্যশস্য, ডাল ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে বলা। যা তারা বাড়ির বাগান, নার্সারী বা রাস্তার ধার থেকে সংগ্রহ করতে পারে। এরপর ছাত্রছাত্রীদের ওই বীজগুলোকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার আকার, আয়তন, রং ও কোথা থেকে তারা তা সংগ্রহ করেছে তার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করতে বলা। এরপর কীভাবে তারা এই শ্রেণিবিন্যাস করেছে তা নিয়ে একটি আলোচনার আয়োজন করা। যথাযথভাবে শ্রেণিবিন্যাস করার পর ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের কোনও এক জায়গায় 'ডিসপ্লে কর্ণার' করে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। ছাত্রছাত্রীরা এরপর সংগৃহীত বীজ নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে বা অন্য যারা তা বপন করতে চান তাদেরকে দেওয়া।

অন্যভাবে/ বাড়তি কিছু কর্মভিত্তিক পাঠ - ছাত্রছাত্রীদের কোনও একটি প্রজাতির কিছু বীজ সংগ্রহ করতে বলা। তারপর সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করতে বলা। একটি ভাগের বীজগুলোকে একটি পাত্রে রাখা পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা জলে ফেলতে হবে। কোনও নাড়াচাড়া না করে তা ঘণ্টা চারেক একইভাবে রেখে দিতে হবে। এরপর জলে ভেজা বীজগুলোকে অন্যভাগের শুকনো বীজগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে হবে। দেখা যাবে, জলে ভেজা বীজগুলো ফুলে বড় হয়ে গেছে, কোনও কোনও বীজের ত্বক কুচকে গেছে আবার কিছু বীজের ত্বক পুরোপুরি ফেটে গেছে। এবার কেন এমন হল তা নিয়ে আলোচনা করা।

ছাত্রছাত্রীদের বলা, কিছু বীজ পাত্রে রাখা মাটিতে বপন করে পাত্রটিকে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে রেখে দিতে। এরপর ওই বীজের অঙ্কুরোদ্গম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দেখা যাবে বিভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্গম বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে। এছাড়া কীভাবে ছোট চারার পাতা ও মূল বিকশিত হচ্ছে ইত্যাদি।

যে কোনও সময় ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ১ ঘণ্টা সময়কাল ধরে এই কৃত্যালির আয়োজন করা যেতে পারে। তবে নিজের এলাকায় বা বড়িতেও এককভাবে ছাত্রছাত্রীরা এই কৃত্যালি করে দেখতে পারে।

সূত্র – Joy Of Learning (Standard 6 to 8)

"ভাল চরিত্র এবং মূল্যবোধ ছাড়া বেশি নম্বর পাওয়া শিক্ষা নয়"- জন ডিউই

দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি, বর্ণ ও পেশার মানুষের বাস। প্রত্যেক মানুষ বা মানবগোষ্ঠী পেশাভিত্তিক মেধা, যোগ্যতা এবং দক্ষতার কারণে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোনও মানবগোষ্ঠীই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং বাধ্য হয়েই পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে সমাজে দুই শ্রেণির মানুষ বাস করে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। আবার অক্ষর জ্ঞানের ভিত্তিতে, অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ও নিরক্ষর। তবে প্রত্যেক শ্রেণির মানবসমাজের জন্য দুটি জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ।

সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সার্বজনীন। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হলে এই বিষয়টি তখনই অনুধাবন করা সম্ভব। পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নও আবশ্যক। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব জীবন থেকে জানার মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষা মূলত মানুষের জীবন ও সমাজসম্পৃক্ত একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষার দুটি দিক হল Knowledge বা জ্ঞান এবং Learning বা শিখন। যে প্রক্রিয়ার শিখন অর্জন করা যায় তা শিখন প্রক্রিয়া। এক কথায়, জ্ঞান, দক্ষতা, অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মানের যে ইতিবাচক পরিবর্তন হয় তাই শিখন। শিখন প্রক্রিয়া কিন্তু জীবনব্যাপী। এর মাধ্যমেই বাস্তব জীবনে এবং মানব আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। যার মধ্যে শিখন প্রক্রিয়া যতবেশি বিকশিত হয়, সে ততবেশি পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দেয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, বিশেষজ্ঞদের মতে তার মূল কারণ এটাই। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইমের অবদান এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। 'শিক্ষাকে' সামাজিক বস্তু এবং সামাজিক ঘটনা হিসাবে ব্যক্ত করে তিনি একে সামাজিকীকরণের বাহন বলেছেন। একইভাবে ম্যানহার্টসও শিক্ষাকে সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে সমাজ প্রকৃতির প্রেক্ষিতে শিক্ষার ধারণা নির্মাণ এবং বিশ্লেষণ করেছেন। আমেরিকার দার্শনিক জন ডিউই দর্শন, মনসতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সমন্বিত ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁর মতে, শিক্ষা শুধু জীবন প্রস্তুতের উপায় নয়, তা জীবনযাপনের প্রণালীও বটে। বিদ্যালয়কে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেছেন। এই ধারণার আলোকে শিক্ষক সমাজের আগে শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। তা না হলে শিক্ষকরা উদার হতে পারবেন না, আর তাঁরা উদার না হলে জ্ঞান বিতরণ করে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণে ব্যর্থ হবেন।

আন্তর্জাতিক কমিশন রিপোর্ট (১৯৯৭) বা ডেলোর কমিশন রিপোর্টে একুশ শতকের জন্য শিক্ষাকে মানবজীবন সম্পৃক্ত একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া বলা হয়েছে। ব্যক্তির "জীবনব্যাপী শিখন"-এর উপর কমিশন রিপোর্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রধান কৌশল হিসাবে চারটি স্তম্ভ (Four pillars of education) নির্ধারিত হয়েছে, জানতে শেখা (Learning to know), করতে শেখা (Learning to do), মিলেমিশে বাস করতে শেখা (Learning to live together) ও বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা (Learning to be)।

মানব জীবনের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি জৈবিক দিক ও অন্যটি সমাজ সত্ত্বার। অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষায় দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হলে মানুষ পরিপূর্ণ হয়। এপ্রসঙ্গে গোয়েটিং বলেন, "Just as there are certain vital processes of life in a biological sense, so education may be considered as a vital process in a social sense." একারণেই শিক্ষা সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, শিক্ষার ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের সমকালীন। পরিবর্তন এসেছে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও এবং পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক। এই স্তরের শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে খুব একটা আলোচনার সুযোগ নেই। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় এনিয়ে আলোচনা হয় না। এই স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন নন। আর প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার কোনও সুযোগই নেই। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেখানে স্থায়ী শিক্ষক থাকে না। থাকলেও জ্ঞান বিতরণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মালিকপক্ষের উপর নির্ভরশীল। মানবিক মূল্যবোধের আলোয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠাতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানকে সংযুক্ত করা আবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষককে এবিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারিগরি ও মানবিক দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির মেধা, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে জীবনমুখী করতে আগে আগে দরকার দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন। অমানবিক প্রবণতার কমাতে অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন প্রক্রিয়া জারি রাখতে হবে। শিক্ষিত সমাজের মেধা ও দক্ষতাকে মানবিক দক্ষতায় পরিণত করতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনায় তা থাকা আবশ্যক।

এই বিশ্ব

সূত্র- https://en.unesco.org/gem-report/(Global education monitoring)

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশার পথিকের প্রতিক্রিয়া

তারিখঃ_____

নামঃ_____ দূরভাষঃ_____

ঠিকানাঃ_____

পেশাঃ_____

স্কুলের নামঃ_____

(যদি প্রযোজ্য হয়)

নবদিশার গুণগত মানঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ ☐
নবদিশার বিষয়ঃ	প্রাসঙ্গিক	☐	অপ্রাসঙ্গিক	☐			
সৃজনশীলতাঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ ☐
প্রচ্ছদঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ ☐
লেখা দিতে ইচ্ছুকঃ	হ্যাঁ	☐	না	☐			

গুণগত মান নিয়ে মতামতঃ_____

_____

_____

_____

(অনুগ্রহ করে ফর্মটি কেটে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্, ৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
কলকাতা - ৭০০০৩১

_____
স্বাক্ষর

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আমরা আশা করি আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯